কায়না

মন্মথ চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭২

প্রকাশক : মৈনাক বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রসাদ রায়

সৈনিকের প্রথম অভিজ্ঞতা

প্রথম পরিচ্ছেদ: রহস্যময় মৃত্যু

কায়না!

মৃত্যু-গহ্বর!

হ্যাঁ, উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় ভাষা 'কায়না' শব্দটির অর্থ— 'যাতনাদায়ক মৃত্যু-গহ্বর'!

—'কায়না! একবার, মাত্র একবারই ঐ ভয়ানক শব্দ উচ্চারণ করেছিল স্থানীয় পুলিশ কর্মচারী, তারপরই তার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।'

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! 'মিঃ হুইংক্লির মুখে পূর্বোক্ত ঘটনা শুনে চমকে উঠলেন পর্যটক আণ্ডিলিও গল্ডি, 'কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল?'

'হ্যাঁ।'—উত্তর রোডেশিয়ার প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'স্থানীয় পুলিশ জনৈক নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে তার বক্তব্য পেশ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু 'কায়না' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। ঘটনাটা হঠাৎ শুনলে, খুব অদ্ভুত ও অলৌকিক মনে হয়, তবে একটু ভেবে দেখলে সমস্ত বিষয়টার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা সম্ভব। লোকটির হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা ভালছিল না, আর অনেকটা পথ সে দৌড়ে এসেছিল—তাই অত্যধিক পরিশ্রম ও উত্তেজনার ফলে দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটা খুব অসম্ভব নয়। আমি স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে দুবার 'কায়নার' নাম শুনেছি। কিন্তু প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বারও 'কায়না' সম্বন্ধে কোনও জ্ঞাতব্য-বিষয় আমার কর্ণগোচর হয় নি; কারণ সেবারেও মৃত্যু এসে অতর্কিতে বক্তার কণ্ঠরোধ করেছিল।'

আন্তিলিও বললেন, 'প্রথমবারের ঘটনা তো শুনলাম। দ্বিতীয়বারের ঘটনাটা বলুন।"

কমিশনার মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'একটি স্থানীয় বৃদ্ধার মুখে আমি দ্বিতীয়বার ঐ কথাটা শুনেছিলাম। সে আমাকে জানিয়েছিল, কায়নার ভিতর তার চার পুত্র সন্তানকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর কোনও কথা শোনার সুযোগ আমার হয় নি। কারণ, ঐটুকু বলেই বৃদ্ধা চুপ করেছিল।'

আত্তিলিও প্রশ্ন করলেন, 'ভয়ে চুপ করেছিল?' উত্তর এল—এল—'না। সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু হয়েছিল।'

আত্তিলিও বৃদ্ধার মৃত্যুকে বিষপ্রয়োগে হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কমিশানার হুইংক্লি জানালেন আত্তিলিওর সন্দেহ অমূলক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মিঃ হুইংক্লি, তারপর বললেন 'আমার মনে হয় কায়নার কথা উল্লেখ করেছিল বলেই যে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছিল তা নয়, বরং ঠিক উল্টো ব্যাপারটা ঘটেছিল।'

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান মৃত্যু আসন্ন বুঝেই বৃদ্ধা কায়নার বিষয়ে উল্লেখ করতে সাহস পেয়েছিল?'

—'হ্যা। স্থানীয় অধিবাসীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ। আসন্ন মৃত্যুকে তারা অনুভব করতে পারে। অন্তিম-মুহূর্তে বৃদ্ধা কায়নার রহস্য ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যু তার কণ্ঠ রোধ করে।

গল্প করতে করতে উপরোক্ত ঘটনা দুটির বিবরণ দিচ্ছিলেন উত্তর রোডেশিয়ার প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি, এবং দুই বন্ধুর পাশে বসে সাগ্রহে তাঁর কথা শুনছিলেন আত্তিলিও গত্তি। বন্ধু দুটির নাম প্রফেসর ও বিল। বন্ধুদের সম্পূর্ণ নাম আত্তিলিও তাঁর কাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করেন নি, অতএব আমরাও তাঁদের 'প্রফেসর' আর 'বিল' নামেই ডাকব।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ

করেছিলেন কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গন্তি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আফ্রিকার জীবজন্তু ও মানুষ সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উক্ত মহাদেশের কয়েকটি স্থানে তিনি ভ্রমণ করতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। ঐ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন পূর্বোক্ত দুই বন্ধু, প্রফেসর ও বিল। উত্তর রোডেশিয়ার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলো জলাভূমি আবিষ্কার করেছিলেন আন্তিলিও এবং তাঁর দুই বন্ধু। শুধু তাই নয়, বিস্তীর্ণ জলাভূমিগুলোর অবস্থান নির্ণয় করার উপযুক্ত একটি মানচিত্রও তাঁরা তৈরি করে ফেলেছিলেন। স্থানীয় গভর্নর অভি-যাত্রীদের সাফল্যে খুশী হয়ে তিন বন্ধুকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আহারাদির পর তাঁরা গভর্নরের লাইব্রেরীতে এলেন কফি পান করার জন্য।

প্রফেসর হঠাৎ উত্তর রোডেশিয়ার বনভূমি সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করলেন। জলাভূমিগুলো পরিদর্শন করে ফিরে আসার সময়ে ঐ অঞ্চলের 'গ্র্যানাইট' পাথর দেখেই তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন—

'এমন অদ্ভুত নিসর্গ-দৃশ্য আমি আফ্রিকার কোনও জায়গায় দেখি নি।'

অরণ্যের পটভূমিতে অবস্থিত অসংখ্য প্রস্তরসজ্জিত গুহার দৃশ্য বিলকেও অভিভূত করে দিয়েছিল।

নৈশভোজে উপস্থিত রাজপুরুষদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উত্তর রোডেশিয়ার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত—ঐ অঞ্চলের কোনও বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা ছিল না।

মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'কোনও শ্বেতাঙ্গ এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন নি। এখানে গাড়ী চলার রাস্তা নেই। যতদূর জানি, খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায় না। 'মাম্বোয়া' নামক যে নিগ্রো জাতি এখানে বাস করে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তারা লাজুক প্রকৃতির এবং শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে আসতে অনিচ্ছুক—সরকারও তাদের

ঘাঁটিয়ে অনর্থক বিপত্তির সৃষ্টি করতে চান না।'

মিঃ হুইংক্লির কথা শুনে প্রফেসর ও বিল দুজনেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে জানালেন যে, ঐ অঞ্চলের বিচিত্র নিসর্গ-দৃশ্য দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছে প্রকৃতি-দেবীর বহু গোপন-তথ্য সেখানে লুকানো আছে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে তাঁদের পক্ষে সেই গোপন রহস্যগুলো আবিষ্কার করা খুব কঠিন হবে না। আত্তিলিও কোনও কথা বলেন নি, সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি তখন পর্যন্ত—ঐ ধরনের অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা ছিল, তাই কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি আত্তিলিও সাহেব।

মিঃ হুইংক্লি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনারা যদি মৃত্যুগহ্বরের আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হয় বটে!'

—'মৃত্যু-গহ্বর! সে আবার কি?'

তিন বন্ধুই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

কমিশনার মিঃ হুইংক্লি তখন যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে—'কায়না' নামক এক মৃত্যু-গহ্বরের কথা স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শোনা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে উক্ত স্থানের সত্যিই কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে তিনি খুব নিঃসন্দেহ নন। হয়তো সবটাই গুজব অথবা কুসংস্কার-আচ্ছন্ন স্থানীয় মানুষের কল্পনার ব্যাপার। তবে পর পর দুবার 'কায়না' শব্দটি যে মিঃ হুইংক্লির শ্রুতিগোচর হয়েছিল সে কথাও তিনি জানিয়ে দিলেন এবং তারপর পুলিস কর্মচারী ও বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ এই কাহিনীর শুরুতেই বলা হয়েছে।

সব কথা শুনে বিল আর প্রফেসর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সম্ভব হলে সেই মুহূর্তেই তাঁরা মৃত্যু-গহ্বরের সন্ধানে যাত্রা করতে প্রস্তুত। আত্তিলিও বন্ধুদের কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ না করলেও কায়না-অভিযানে তাঁর আপত্তি ছিল না। শেষকালে

অবশ্য বিপদের গুরুত্ব বুঝে প্রফেসর ও বিল পিছিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহাযুদ্ধের সৈনিক আত্তিলিও গত্তি একবার কাজ শুরু করে পিছিয়ে আসতে রাজী হলেন না—উদ্দেশ্য পুরণের জন্য বারবার তিনি ঝাপিয়ে পড়েছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

সে সব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গভর্নরের গৃহ থেকে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসতে আসতেই তিন বন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন। তাঁরা জানতেন স্থানীয় সরকার তাঁদের সাহায্য করবেন। কিন্তু সরকারেরর সাহায্য পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। কাজটা খুবই কঠিন। মাম্বোয়া জাতির প্রধান ব্যক্তিরা অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য জানতে পারলে বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেই বাধা-বিপত্তি জয় করে প্রায় ২০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল অজানা স্থানে এক গোপন গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যে কতখানি কঠিন, সে কথা অন্ততঃ আত্তিলিওর অজ্ঞাত ছিল না—বিপদের গুরুত্ব বুঝেই তিনি এই অভিযান সম্পর্কে প্রথমে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। কিন্তু অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আত্তিলিওর মনের ভাব বদলে গেল। বাস্তব-জগতে যদি সত্যিই মৃত্যু-গুহার অস্তিত্ব থাকে, তবে যেমন করেই হোক ঐ জায়গাটা খুজে বের করার প্রতিজ্ঞা করলেন আত্তিলিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ত্রয়ী

কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি যে প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র পক্ষের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আফ্রিকা-মহাদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্যই আফ্রিকা-ভ্রমণ উদযোগী হয়ে উত্তর রোডেশিয়াতে পদার্পণ করেছিলেন, সে কথা এই কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সেনাবাহিনীর মানুষটি হঠাৎ সৈনিকের ভূমিকা ত্যাগ করে

পর্যটকের ভূমিকা গ্রহণ করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন কেন সে কথা জানতে হলে কম্যাণ্ডার সাহেবের পূর্বজীবন নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। প্রফেসর ও বিল নামে আত্তিলিওর যে দুজন বন্ধুর নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও বর্তমান কাহিনীর পাঠকদের বিশেষ পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই ধরা যাক আত্তিলিওর কথা, কারণ তিনি হলেন এই কাহিনীর নায়ক।

সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরে জ্বলতে জ্বলতে প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী অগ্নি যখন নির্বাণলাভের উপক্রম করছে—অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ দিকে—হঠাৎ আহত হলেন আত্তিলিও সাহেব। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে মিশরে পাঠানো হল। আত্তিলিওর বুকে গুলি লেগেছিল; তার উপর 'ফ্লু'রোগের আক্রমণ তাঁকে যক্ষ্মার কবলে ঠেলে দিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে আত্তিলিও খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে বললেন, সাহারা মরুভূমিতে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকলে আত্তিলিওর অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

আত্তিলিও ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। গরম বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তিনি বসে থাকতেন। মাত্র একমাস পরেই তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর দেহ রোগমুক্ত হয়েছে এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে বিস্তর আরব-বেদুইনের সঙ্গে তিনি ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। মরুভূমির মধ্যে একটা সজীব নরমুণ্ড দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে ছুটে আসতো এবং তপ্ত বালুকার গর্ভে আত্তিলিওকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতো। ঐ সময়ে আরবী ভাষার সঙ্গে আত্তিলিওর পরিচয় হয়।

সাহারার তপ্ত বালি আত্তিলিওর যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দিল। গুলির আঘাতে তাঁর দেহে যে ক্ষত হয়েছিল, সেই ক্ষতস্থানও

শুকিয়ে গেল। কিন্তু এইবার এক নূতন দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করল। যক্ষ্মার চেয়েও মারাত্মক এই রোগের নাম আফ্রিকা-জ্বর। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ আফ্রিকাকে ভালবেসে পাগল হয়—অরণ্য, পর্বত, নদী ও মরুভূমি-সজ্জিত এই বিশাল মহাদেশ তার দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সন্তানদের নিয়ে বিদেশী মানুষকে এমন দুর্ভেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ধরে যে, কিছুতেই তার নিস্তার থাকে না। আফ্রিকা-জ্বরে আক্রান্ত মানুষ পৃথিবীর কোন স্থানে গিয়েই স্বস্তি পায় না—বার বার সে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে আফ্রিকার বুকে, বন্য প্রকৃতির সহচর্য উপভোগ করার জন্য। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিদেশী এই আফ্রিকা-জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন।

পূর্বোক্ত আফ্রিকা-জ্বর আত্তিলিও সাহেবকে আক্রমণ করেছিল। নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করার আয়োজন শুরু করলেন। উক্ত মহাদেশের বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করার সংকল্প করেন এবং ঐ কাজে তাঁকে সাহায্য করার উপযুক্ত মানুষের সন্ধান করতে থাকেন। সেই সময়ে প্রফেসরের সঙ্গে আত্তিলিও গত্তির সাক্ষাৎ হয়। আত্তিলিওর অভিযানে বিজ্ঞান-বিষয়ক যে কোনও ব্যাপারেই প্রফেসরের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হতো। প্রফেসরের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করেন নি আত্তিলিও; তিনি ভদ্রলোককে প্রফেসর বলেই ডাকতেন, আমরাও তাই ডাকব। আত্তিলিওর লিখিত বিবরণী থেকে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, প্রফেসর একজন ফরাসী চিকিৎসক।

এবার বিলের কথা বলছি। সংবাদপত্রে অভিযান-পরিচালনার কাজে সহকারীর জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন আত্তিলিও, সেই বিজ্ঞাপন দেখেই বিল আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে বিল একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল। চিঠি পড়ে আত্তিলিও জানতে পারলেন যে, বিল মোটা মাহিনায় একটি হিসাব-পরীক্ষার প্রতিষ্ঠানে কার্যে নিযুক্ত আছে এবং অবসর সময়ে পড়াশুনা করে প্রত্নতত্ত্ব

সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে। হিসাব পরীক্ষা ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বিল যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সেই অভিজ্ঞতা আত্তিলিওর কাজে লাগতে পারে বলেই বিলের বিশ্বাস এবং আত্তিলিও যদি তাকে অভিযানে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে হিসাব-পরীক্ষার অফিসে মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে সে যে সাগ্রহে অভিযানে যোগ দিতে রাজি আছে, এই কথাও জানিয়ে দিয়েছে বিল লিখিত আবেদনপত্রে।

এই ধরনের বহু চিঠি আসতো প্রতিদিন, কিন্তু বিলের চিঠি হঠাৎ আত্তিলিওর খুব ভাল লেগে গেল। পত্রযোগে তিনি বিলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। প্রথম দর্শনেই তিনি বিলকে পছন্দ করলেন, কয়েক মিনিট কথা বলেই তিনি বুঝলেন, ঠিক বিলের মতো মানুষকেই তাঁর প্রয়োজন। বিলের পূর্বজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করে আত্তিলিও জানালেন, মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই এক দুর্ঘটনার ফলে সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল। বিলের এক আত্মীয়া তাকে সন্তান-স্নেহে পালন করেছিলেন, তাঁর যত্নেই বিল মানুষ হয়েছে। যে দুর্ঘটনার ফলে বিল তার মা-বাবাকে হারিয়েছিল, সেই ঘটনার কথা সে আত্তিলিওকে বলে নি। পরে অবশ্য বলেছিল, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে—অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তকে বাধা দিতে পারেন নি আত্তিলিও। যে দুর্ঘটনার ফলে বিল প্রথমে মা এবং পরে বাবাকে হারিয়েছিল, সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ আগে শুনলে হাতি-শিকারের জন্য বিলের অস্বাভাবিক আগ্রহের কারণ অনুমান করে আত্তিলিও সাবধান হতেন, কিছুতেই তাকে আফ্রিকায় নিয়ে যেতেন না।

বিলের মা-বাবা যে অভাবিত ঘটনার শিকার হয়েছিলেন, নিউইয়র্কে সংঘটিত সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা হচ্ছে বাস্তব-জীবনের এক ভয়াবহ নাটক ; এবং সেই নাটকের রক্ত-রঞ্জিত শেষ দৃশ্যের যবনিকা পড়েছিল অরণ্য-আবৃত আফ্রিকার অন্তঃপুরে।

যথাসময়ে সেই কাহিনী আমরা জানতে পারব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাম-মাহাত্ম্য

গভর্নরের গৃহ থেকে নৈশভোজে আপ্যায়িত হয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসার পথে তিন বন্ধুর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনার ফলে তাঁরা যে মৃত্যু-গহ্বরেব সন্ধানে অভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি, এখন দেখা যাক পরবর্তী ঘটনার স্রোত তিন বন্ধুকে কোন পথে নিয়ে যায়।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে আছেন তিন বন্ধু। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে রাতের খানা নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল একটি ছোকরা চাকর। তিন বন্ধু লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন, ছোকরার হাতের উপর মস্ত বড় থালাতে ঝোলের মধ্যে শুয়ে একটা মুরগী সর্বাঙ্গ থেকে ধূম-উদ্গীরণ করছে। চিকেনকারি! গরম!

তিন বন্ধুর রসনা সজল হয়ে উঠল।

হঠাৎ কি খেয়াল হল, প্রফেসর বলে উঠলেন, 'কায়না!'

ঝন্-ঝনাৎ! অ্যালুমিনিয়মের থালাটা ছোকরার হাত থেকে ছিটকে পড়ল মাটির উপর!

দারুণ ক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম করলেন আন্তিলিও, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরিয়ে আসার আগেই চাকরটা তীরবেগে তাঁবুর বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আন্তিলিও তৎক্ষণাৎ চাকরদের তাঁবুর দিকে পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছানোর আগেই তিনি শুনতে পেলেন কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পরক্ষণেই দ্রুত ধাবমান পায়ের আওয়াজ।......

তিন বন্ধু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তাঁরা তিনজন ছাড়া আশেপাশে কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই, নিগ্রো চাকররা সবাই অদৃশ্য হয়েছে।

না, সবাই নয়, জামানি নামক জুলু জাতীয় যে রাঁধুনিটি

অভিযাত্রীদের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই লোকটি স্থান ত্যাগ করে পালায় নি। পলাতক পাঁচটি চাকরই ছিল উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় অধিবাসী। প্রফেসরের মুখে 'কায়না' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা চাকর সকলের কাছে সেই সংবাদ বিতরণ করেছে, এবং তার ফলেই বিহ্বল হয়ে মানুষগুলো যে গা-ঢাকা দিয়েছে, এ বিষয়ে অভিযাত্রীদের কোন সন্দেহ ছিল না।

রাতের লোভনীয় খাদ্য মাটির উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, চাকররা উধাও হয়েছে জিনিসপত্র ফেলে, তিন বন্ধুর চোখ-মুখ কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল। একটা স্পষ্ট সত্য তাঁরা বুঝতে পেরেছেন: ভৃত্যদের দারুণ আতঙ্ক প্রমাণ করছে মৃত্যু-গহ্বর অলীক কল্পনা নয়। বাস্তব-জগতেই বিরাজ করছে ঐ ভয়-দেখানো ভয়ানক 'কায়না'।

শুকনো খাদ্যের টিন খুলতে খুলতে অভিযাত্রীরা প্রতিজ্ঞা করলেন, 'কায়না' নামের ঐ বিভীষিকাকে যেমন করেই হোক তাঁরা আবিষ্কার করবেন।

প্রতিজ্ঞা করা সহজ, প্রতিজ্ঞা রাখা সহজ নয়।

উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় মানুষ মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের এড়িয়ে চলতে লাগল। মাম্বোয়া জাতির কোনও লোকের কাছে পথের সন্ধান চাইলে সে ভুল পথের নির্দেশ দিতো, কাজ করতে বললে পলায়ন করতো ঊর্দ্ধশ্বাসে। চারদিক থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতো তিন বন্ধুর কানে, এখানে-ওখানে চোখে পড়তো শূন্যে ভাসমান ধোঁয়ার কুণ্ডলী—মাম্বোয়াদের সঙ্কেত।

অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য এখন আর মাম্বোয়াদের অজানা নয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভেসে যায় ধোঁয়ার অক্ষরে লেখা কুণ্ডলী-পাকানো দুর্বোধ্য সতর্কবাণী—'সাবধান! সাদা মানুষ এসেছে। মৃত্যু-গহ্বরের সন্ধানে।'

ঢাকের আওয়াজ ও ধোঁয়ার সাঙ্কেতিক অর্থ সঠিক ভাবে বোধগম্য না হলেও মাম্বোয়াদের মনোভাব অভিযাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেও জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পেলেন না তিনবন্ধু। অভিযাত্রীদের আগমন-সংবাদ আগেই পেয়ে যেতো গ্রামবাসীরা এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা যে স্থান ত্যাগ করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অভিযাত্রীরা বুঝলেন, মাম্বোয়া-জাতি তাঁদের 'বয়কট' করছে!

অবশেষে তাঁরা জেলা-কমিশনারের সঙ্গে দেখা দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। কমিশনার তাঁদের কথা শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং সক্রিয়ভাবে অভিযাত্রীদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু মাম্বোয়াদের মধ্যে যারা কমিশনারের একান্ত অনুগত ছিল, তারাও তাঁর কথায় অভিযাত্রীদের দলে যোগ দিতে রাজী হল না। অবশেষে চারজন মাম্বোয়া বন্দী অভিযাত্রীদের দলে কাজ করতে সম্মত হল। তারা বোধহয় ভেবেছিল, দিনের পর দিন বন্দী অবস্থায় গাধার খাটুনি না খেটে (ঐ সময়ে একটা রাস্তা তৈরীর কাজে তারা নিযুক্ত ছিল) যদি পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহলে ক্ষতি কি? তাছাড়া, ভালভাবে কাজ করলে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জেলা কমিশনার। অতএব বন্দী চারজন মহা উৎসাহে অভিযাত্রীদের দলে যোগ দিল।

ইতিমধ্যে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে অভিযাত্রীদের দস্তুর মতো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কমিশনার বেশ বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি রটিয়ে দিলেন গুহাবাসী জন্তুজানোয়ার দেখার জন্যই অভিযাত্রীরা এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছেন। ধাপ্পায় কাজ হল; মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের সঙ্গে কিছুটা সহজভাবে মেলামেশা শুরু করল। তিন বন্ধু এবার সাবধান হয়েছেন। কায়নার নাম-মাহাত্ম্য যে বিপত্তির সূচনা করেছিল, তা এত শীঘ্র ভুলে যাওয়ার কথা নয়—কেউ আর কায়নার নাম মুখে আনতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গুহাতে মৃত্যুর ছায়া

কায়না-অভিযান ভালভাবে চালানোর জন্য একটা মানচিত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উক্ত বস্তুটিকে কোথাও পাওয়া গেল না বলে অভিযাত্রীরা ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেরাই এলাকাটা পরিদর্শন করে একটা চলন সই মানচিত্রের খসড়া তৈরি করে নেবেন।

কাজটা দুচার দিনের মধ্যে হওয়ার নয়, বেশ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যে কয়দিন ওটা তৈরী না হয়, সেই কয়দিনের জন্য একটা স্থায়ী আস্তানার প্রয়োজন। অতএব স্থায়িভাবে একটা তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুটা যেখানে পাতা হয়েছিল সেই জায়গাটার চারদিকে পড়েছিল অজস্র 'গ্র্যানাইট' পাথর। সমস্ত অঞ্চলটা যেন গ্র্যানাইট পাথরের রাজত্ব—যেদিকে চোখ যায় খালি পাথর আর পাথর।

একটা তাঁবু খাটিয়েই কাজ শেষ হল না। জিনিসপত্র সাজ-সরঞ্জাম মজুত করার জন্য কয়েকটা কুঁড়েঘর তোলা দরকার—কিন্তু শক্ত পাথুরে-মাটির উপর খুঁটি পুঁতে ঘর তোলা কি দুই-চারজনের কাজ? তাছাড়া বাক্স-বন্দী অজস্র সাজসরঞ্জাম বহন করার জন্যও তো কিছু লোকের দরকার। খুঁটিনাটি আরও যে সব কাজ ছিল তার জন্যও লোক চাই, অর্থাৎ বেশ কিছু জনমজুর না হলে অভিযাত্রীদের আর চলছে না।

তিন বন্ধুর সঙ্গে যে চারজন মাম্বোয়া-বন্দী কাজ করার জন্য এসেছিল, তাদের এবার পদোন্নতি ঘটল। খাটুনির কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে আম্ভিলিও তাদের জন-মজুর সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করলেন—তারা হয়ে গেল 'রিক্রুটিং অফিসার'!

কাজটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছিল; ঐ কাজে তারা যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছিল। মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক এবং নানারকম উপহার পেয়ে মাম্বোয়ারা ভারি খুশী; সেই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে

পড়তেই লুব্ধ জনতার স্রোত এমন-ভাবে বাড়তে লাগল যে মাসখানেক পরেই অভিযাত্রীরা দেখলেন লোকের অভাবে বিপন্ন হওয়ার কোনও কারণ আর নেই।

মাম্বোয়ারা খুব মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। মাম্বোয়া সর্দার অভিযাত্রীদের জানাল, তার প্রজাদের মধ্যে চারজনকে তাঁরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছেন বলে সে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং সব রকমে তাঁদের সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। বন্দী চারজন স্থানীয় মানুষ, অন্ততঃ শতাধিক গুহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল, তবু যদি প্রয়োজন হয় সর্দার নিজে তাদের সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তারা সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে।

খুব ভাল কথা। খুব আনন্দের কথা। বিল ও প্রফেসর মাম্বোয়া-সর্দারের কথায় ও ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু আন্তিলিওর মনে খটকা লাগল—হঠাৎ মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠল কেন? এটা অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নয় তো? আন্তিলিও বন্ধুদের কাছে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করলেন না, মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন।

অভিযানের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলানোর জন্য অভিযাত্রীরা পরামর্শ করতে বসলেন। পরামর্শের ফলে স্থির হল, প্রত্যেক দিন তিনবন্ধু তিনদিকে যাবেন। বন্দী মাম্বোয়া চারজনের মধ্যে দুজন যাবে প্রফেসরের সঙ্গে, দুজন যাবে বিলের সঙ্গে, এবং জামানি নামক জুলু-অনুচরটি থাকবে আন্তিলিওর সঙ্গে। পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি দল হবে তিনটি ভিন্ন পথের পথিক।

অল্প সময়ের মধ্যে একটা বৃহৎ এলাকা পরিদর্শন করার পক্ষে ঐ পরিকল্পনা খুবই উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভাবতে গেলে বলতে হয় পরিকল্পনাটা ছিল অতিশয় মারাত্মক। কারণ, গুহার মধ্যে প্রবেশ করে অভিযাত্রীদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হন, তবে সম্পূর্ণ এককভাবেই তাঁকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। নিগ্রোদের মধ্যে কেউ গুহার

ভিতর প্রবেশ করতে চাইবে না—তারা অপেক্ষা করবে গুহার বাইরে—এবং গুহার ভিতর থেকে আচম্বিতে শ্বাপদকণ্ঠের হিংস্র গর্জন কানে এলে তারা যে পদযুগলের দ্রুত ব্যবহার না করে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এমন নিশ্চয়তা আছে কি? নিগ্রোরা স্থানীয় মানুষ, খুব সহজেই পথ চিনে তারা তাঁবুতে ফিরে আসতে পারবে, কিন্তু বিদেশী অভিযাত্রী শ্বাপদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেও গুহার বাইরে এসে নিগ্রোদের দেখা না পেলে আবার বিপদে পড়বেন—ছোট বড় অসংখ্য গ্র্যানাইট পাথরের দুর্গ, সুড়ঙ্গ আর গোলকধাঁধা ভেদ করে তাঁর পক্ষে সঠিক পথের নিশানা ধরে তাঁবুতে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব।

এইসব বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করেই অভিযাত্রীরা অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিপদ যে হয় নি তা নয়, হয়েছিল। জামানি এবং মাস্বোয়া পথপ্রদর্শকরা সকলেই গুহার সান্নিধ্য অপছন্দ করতো। পথ দেখিয়ে গুহার সামনে নিয়ে যেতে তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু গুহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় ফিট পঞ্চাশ দূরে এসেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো, কিছুতেই আর অগ্রসর হতে চাইতো না। তাদের দোষ নেই; কয়েকদিনের ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে তাদের ভয় পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

একটা অজানা গুহার মধ্যে একদিন হঠাৎ বিলের সঙ্গে একটা হায়নার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বিল গুলি ছুঁড়ল—গুহার অস্পষ্ট অন্ধকারে তার নিশানা ভাল হয় নি,—ফলে জন্তুটা মরল না। আহত হল। দ্বিতীয়বার গুলি চালিয়ে হায়নাটাকে হত্যা করার আগে জন্তুটা বিলের হাঁটুতে একবার নখের আঁচড় বসিয়েছিল। বিল ক্ষতটার দিকে নজর দেয় নি। হায়না মেরে সে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এবং তারপরেও ক্ষতচিহ্নটাকে 'সামান্য আঘাত' বলে তুচ্ছ করেছিল। তাচ্ছিল্যের পরিণাম বিলের পক্ষে ভাল হয় নি। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে তার ক্ষতটা এমন ভীষণভাবে বিষিয়ে উঠল যে আস্তিলিও ভাবলেন বিলকে বাঁচানোর জন্য ঐ পার্টিকে

হয়তো কেটে ফেলতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে 'পদ মর্যাদা' অক্ষুণ্ণ রেখেই বিল সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করতে সমর্থ হয়।

আর একবার ভারসাম্য হারিয়ে প্রফেসর হঠাৎ পড়ে গেলেন একটা শুকনো গাছের ডালপালার মধ্যে। ডালগুলোতে পাতা ছিল না একটিও। কিন্তু কাঁটা ছিল প্রচুর পরিমাণে। কাঁটার আঘাতে প্রফেসরের জামাকাপড় হল ছিন্নভিন্ন, দেহের চামড়ায় হল একাধিক ছিদ্রের সৃষ্টি এবং ঐ ছিদ্রপথে কাঁটার বিষ প্রফেসরের রক্তে ঢুকে তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। কাঁটার মধ্যে কি ধরনের বিষ ছিল ভগবানই জানেন—ঝাড়া দশদিন ধরে প্রফেসর ভুগলেন প্রচণ্ড জ্বরের আক্রমণে।

জ্বরের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটু সুস্থ হয়েই প্রফেসর আবার মৃত্যু-গহ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এবার আর কাঁটা নয়, দু দুটো সিংহের সঙ্গে প্রফেসরের দেখা হল একটা অজানা গুহার মধ্যে। প্রফেসর গুলি ছুঁড়লেন, গুলি লাগল না। সিংহরা আক্রমণের চেষ্টা না করে বিদ্যুদ্বেগে গুহার বাইরে অদৃশ্য হল—রাইফেলের গর্জিত অগ্নিশিখা তাদের মোটেই পছন্দ হয় নি। প্রায়-অন্ধকার গুহার ভিতর দু'দুটো সিংহের মারাত্মক সান্নিধ্য থেকে অক্ষত অবস্থায় পরিত্রাণ পেয়ে খুশী হয়ে প্রফেসর বাইরে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর মাম্বোয়া সঙ্গীদের তিনি দেখতে পেলেন না। প্রফেসর বুঝলেন হয় তারা সিংহের কবলে পড়েছে, আর না হয় তো সিংহদের দেখে গা-ঢাকা দিয়েছে। শেষোক্ত সন্দেহই সত্যি, সিংহদের দেখে তারা দৌড়ে পালিয়েছিল। প্রফেসর যদি বুদ্ধিমানের মতো গুহার সামনে অপেক্ষা করতেন তাহলে তিনি অনেক দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেতেন। কারণ, মাম্বোয়ারা তাঁবু থেকে আত্তিলিওকে নিয়ে অকুস্থলে ফিরে এসেছিল। প্রফেসরকে অবশ্য সেখানে পাওয়া যায় নি। মাম্বোয়াদের না দেখতে পেয়ে প্রফেসর নিজেই তাঁবুতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন এবং দিশাহারা হয়ে গন্তব্যস্থলের বিপরীত দিকে হাঁটতে হাঁটতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিস্তর খোঁজাখুঁজি

করে মাম্বোয়াদের সাহায্যে আন্তিলিও যখন আড়াইদিন পরে প্রফেসরকে আবিষ্কার করলেন, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং জ্বরের আক্রমণে ভদ্রলোকের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়।

আমাদের কাহিনীর নায়ক স্বয়ং আন্তিলিও সাহেবও সঙ্গীদের মতোই গুহার ভিতর বিপন্ন হয়েছিলেন।

সিংহ নয়, হায়না নয়, একটি ছোট, গোলাকার, মাংস পিণ্ডের রোমশ শরীরের উপর হোঁচট খেয়ে আন্তিলিও প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। একদিন বিকেল বেলা আন্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর জামানি তাঁকে একটা সুড়ঙ্গের সামনে এনে জানাল ওটা একটা গুহার প্রবেশপথ। পথটা ছিল খুবই নীচু, খুবই সঙ্কীর্ণ। অতিকষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেন আন্তিলিও, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। অনেকক্ষণ ঐভাবে চলার পর তাঁর মনে হল এতক্ষণে বোধহয় তিনি সুরঙ্গ অতিক্রম করে গুহার ভিতর পৌঁছেছেন। হাতের টর্চ জ্বেলে তিনি দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য—বিজলি-বাতির ক্ষীণ আলোক ধারা হারিয়ে গেছে এক অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহার বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে। ঐ বিশাল গুহার অভ্যন্তরে পদার্পণ করলে প্রস্তর-বেষ্টিত গলিগথগুলোর ভিতর পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে, অতএব ভিতর দিকে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে কিনা ভাবতে লাগলেন আন্তিলিও এবং ভাবতে ভাবতেই হামাগুড়ি-দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন তিনি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের উপর সেই বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করলেন! সঙ্গে সঙ্গে গুহার শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করে জেগে উঠল একটা শব্দ 'ফাঁস্‌স্‌!' পরক্ষণেই জুতোর চামড়ার উপর ধারালো বস্তুর সাংঘাতের শব্দ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জ্ঞান হারালেন আন্তিলিও

টর্চের আলোটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে পায়ের উপর ফেলে আন্তিলিও দেখলেন, তাঁর জুতোর সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে হলুদের উপর কালো-কালো ছাপ-বসানো একটা রোমশ ফুটবল। সেই অতি-জীবন্ত ও অতি ক্রুদ্ধ ফুটবলের মতো গোলাকার বস্তুটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে মার্জারকণ্ঠের গর্জন-ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে জুতোব উপর ধারালো নখের আঁচড় কাঁটার শব্দ।

লেপার্ডের বাচ্চা!

বিড়াল জাতীয় জীবের স্বভাব অনুযায়ী বাচ্চাটা সমস্ত দেহটাকে গোল করে পাকিয়ে আন্তিলিওর জুতোটাকে চেপে ধরেছে এবং তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে মোটা 'হান্টিং-বুট'-এর চামড়া!

বাচ্চাটার চেষ্টা সফল হতো কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু আন্তিলিও তাকে সেই সুযোগ দিলেন না। সজোরে লাথি মেরে বাচ্চাটাকে তিনি দূরে সরিয়ে দিলেন। জন্তুটার ছিটকে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। অন্ধকার গুহার গর্ভে শ্বাপদ-শিশুর ছোট শরীরটা আন্তিলিওর দৃষ্টিগোচর হল না, কিন্তু রুষ্ট প্রতিবাদ ভেসে এল তাঁর কানে—'ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস' শব্দে বাচ্চাটা তার বিরক্তি ও ক্রোধ জানিয়ে দিচ্ছে!

আচম্বিতে সেই শব্দে সাড়া দিয়ে গর্জে উঠল আরও অনেকগুলো বাচ্চা লেপার্ড: 'ফ্যাঁস, ফ্যাঁস, ফ্যাঁস্স্'...

অন্ধকারের ভিতর শ্বাপদ শিশুদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারলেন না আন্তিলিও, কেবল তাদের ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো গর্জনধ্বনি তাঁর কানে ভেসে আসতে লাগল।

আন্তিলিও ভয় পেলেন।

অনেকটা লেপার্ডের মতো দেখতে চিতা নামক যে জন্তুটি আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে, সেই চিতার বাচ্চা দেখলে তিনি ভয়

পেতেন না; কিন্তু আন্তিলিওর অভিজ্ঞ চক্ষু ভুল করে নি, জন্তুটা চিতার বাচ্চা নয়, লেপার্ড-শিশুই বটে। চিতা ভীরু জানোয়ার, লেপার্ড হিংস্র ও ভয়ংকর। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও লেপার্ড মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, বিশেষ করে বাচ্চার বিপদের আশঙ্কায় অন্ধকার গুহার ভিতর ক্ষিপ্ত লেপার্ড-জননীর আক্রমণ যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, সে কথা অনুমান করেই আন্তিলিওর মতো দুঃসাহসী মানুষও ভয় পেয়েছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন, দিনের বেলা অন্ধকার গুহার আশ্রয় ছেড়ে বাচ্চাদের মা বড় লেপার্ডটা বাইরে বেড়াতে যাবে না— সে নিশ্চয়ই গুহার ভিতরে কোথাও অবস্থান করছে এবং বাচ্চাদের নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্যে যে দ্বিপদ জীবটি তার আস্তানায় অনধিকার প্রবেশ করেছে, তাকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আন্তিলিও বাচ্চাদের মা বড় লেপার্ডটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু অন্ধকারে অভ্যস্ত একজোড়া শ্বাপদচক্ষু যে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সেকথা অনুমান করেই আন্তিলিও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

বাচ্চাগুলো ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দে এতক্ষণ ক্রোধ প্রকাশ করছিল, হঠাৎ তারা একসঙ্গে চুপ করে গেল। আন্তিলিওর অনুমান এইবার নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হল: বাচ্চাদের আকস্মিক নীরবতা বড় লেপার্ডটার সান্নিধ্য প্রমাণ করে দিয়েছে।

পালাতে পারলে আন্তিলিও পালিয়েই যেতেন। কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময়ে আক্রান্ত হলে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করাও সম্ভব হবে না। অতএব পলায়নের চিন্তা ছেড়ে গুহার ভিতর দাঁড়িয়ে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। গুহার দেয়ালে পিঠ রেখে আন্তিলিও টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বড় লেপার্ডটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।...

হঠাৎ তাঁর মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল—দুটো বিরাট

পাথরের মাঝখানে টর্চের আলোকধারার মধ্যে ভেসে উঠেছে একজোড়া বৃহৎ নিষ্পলক চক্ষু!

চোখদুটো গোল, সবুজ এবং জ্বলন্ত!

মা-লেপার্ড!

বিপদের মুখোমুখি হতেই বিপদের ভয় কেটে গেল। আত্তিলিওর কম্পিত হাত দুটো হঠাৎ সৈনিকের অভ্যস্ত দৃঢ়তায় রাইফেল ও টর্চ আঁকড়ে ধরল, টর্চের আলোতে জ্বলন্ত চোখ দুটির উপর নিশানা স্থির করতে লাগলেন আত্তিলিও।

লেপার্ড লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল রাইফেলের গুলি। গুলি লাগল, কিন্তু শ্বাপদের গতি রুদ্ধ হল না। সশব্দে লেপার্ড এসে আছড়ে পড়ল গুহার প্রস্তর-প্রাচীরের উপর। শ্বাপদের নিশানা ভুল হয় নি, কিন্তু আত্তিলিও স্থান পরিবর্তন করেছেন বিদ্যুৎ-বেগে। লেপার্ড দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার আগেই আবার গর্জে উঠল রাইফেল, গুলি জন্তুটার মস্তিষ্ক ভেদ করে তাকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিল।

তীব্র উত্তেজনা কেটে যেতেই আত্তিলিও ক্লান্তি বোধ করলেন। কিন্তু ঐ বিপজ্জনক গুহার মধ্যে বিশ্রাম করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সুড়ঙ্গের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি দ্রুতবেগে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই গুহার বাইরে এসে প্রখর সূর্যালোকের নীচে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

জীবনে সর্বপ্রথম জামানি তার প্রভুর আদেশ অমান্য করল। সে কিছুতেই মৃত লেপার্ডের দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিতে রাজী হল না।

'না, মাসাংগা, না',—জামানি বলল, 'এই জন্তুটার চামড়া আমি ছাড়াতে পারব না। এটা লেপার্ড নয়, এটা হচ্ছে লেপার্ডের দেহধারী প্রেতাত্মা! ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিলেই প্রেত ঐ দেহ থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করবে। মাসাংগা! এই দেশটা ভাল নয়, আমাদের এখনই এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

আত্তিলিও অবশ্য জামানির উপদেশ কর্ণপাত করেন নি। মাম্বোয়াদের সন্দেহ চলে গেছে, অভিযাত্রীরা এখন তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন।—এই হচ্ছে অনুসন্ধান-কার্য চালানোর উপযুক্ত সময়, এখন কি ফিরে যাওয়া যায়? মাম্বোয়াদের এখন ধারণা হয়েছে, অভিযাত্রীরা কেবল গুহার ভিতর জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্যই এখানে এসেছেন। এটা অবশ্য তাদের কাছে পাগলামি, তবে এই ধরনের পাগলামিকে প্রশ্রয় দিতে তাদের আপত্তি নেই। সাদা মানুষরা যদি গুহার মধ্যে ঢুকে জন্তুজানোয়ারের আঁচড়-কামড় খেতে চায় এবং সেই কাজে সাহায্য করলে যদি টাকা পয়সা, সিগারেট আর নানারকম উপহার পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সাহায্য করতে আপত্তি কি? তবে হ্যাঁ, কায়নার কথা না বললেই হয়।

অবশ্য অভিযাত্রীরা কায়নার নাম আর ভুলেও উচ্চারণ করতেন না।

একদিন হঠাৎ দুটি মাম্বোয়ার কথা আত্তিলিওর কানে এল। আত্তিলিও ছিলেন তাঁবুর ভিতরে, মাম্বোয়ারা তাঁকে দেখতে পায় নি। তিনি শুনলেন একজন মাম্বোয়া বলছে, 'খুব সম্ভব যে পাঁচটা ছেলে আগে সাদা মানুষের কাছে কাজ করতো, তারা ভুল করেছে। বোধহয় ওরা সাদা মানুষের কথা বুঝতে পারে নি।'

তার সঙ্গী বলল, 'হতে পারে। কিংবা হয়তো ওটা ছিল সাদা মানুষদের ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র! তবে সেই খেয়াল কেটে গেছে, আমরা এখন যেদিকে যেতে বলি ওরা সেইদিকেই যায়। ওরা যেদিকে গেলে আমাদের মাতব্বররা বিপদ হবে বলে মনে করে, সেদিকে ওরা কখনই পা বাড়ায় না।'

আত্তিলিওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মাম্বোয়াদের বিশ্বাস অভিযাত্রীরা মৃত্যুগহ্বর নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। মানচিত্রটা নিয়ে আত্তিলিও দাগ দিতে লাগলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল খুবই সহজ।

মাম্বোয়ারা নিশ্চয়ই কায়নার ধারে কাছে অভিযাত্রীদের উপস্থিতি চাইবে না, অতএব মৃত্যু-গহ্বর যেখানে অবস্থান করছে তার থেকে দূরে দূরেই মাম্বোয়ারা তাঁদের পরিচালিত করার চেষ্টা করবে। যে জায়গাগুলো একবার দেখা হয়ে যায়, ম্যাপের গায়ে সেই জায়গা-গুলোকে চিহ্নিত করে রাখতেন অভিযাত্রীরা। ম্যাপটাতে দাগ দিতে দিতে এক সময় তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন, কোন এলাকাটা বাদ দেওয়া হচ্ছে। একবার যদি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে, একটা নির্দিষ্ট এলাকা মাম্বোয়ারা এড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেই অঞ্চলটায় অভিযান চালালেই মৃত্যু-গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে।

কিন্তু, হ্যাঁ, এখানে একটা 'কিন্তু' আছে।

যেসব এলাকায় যাওয়া হয়েছে, ম্যাপের গায়ে সেই এলাকা-গুলোকে ফুটকির দাগ বসিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে ; এখন পেন্সিলের লাইন টেনে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন জায়গা ম্যাপের উপর চক্রাকারে ছড়িয়ে আছে, অর্থাৎ সেই সব স্থানে এখন পর্যন্ত অভিযাত্রীদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। কিন্তু সেই ছোট ছোট টুকরো টুকরো অনাবিষ্কৃত এলাকার পরিধি বড় কম নয়। এইভাবে আর কতদিন অভিযান চালানো সম্ভব ? ইতিমধ্যেই অভিযাত্রীরা বেশ কয়েকবার বিপদে পড়েছেন। অজানা গুহার অন্ধকারে অনিশ্চিত প্রত্যাশায় দিনের পর দিন জীবন বিপন্ন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ? তিনমাস তো হয়ে গেল, আর কত দিন ?

অতএব পরামর্শ সভা বসল।

প্রফেসর এবং বিল অভিযান চালানোর বিপক্ষে রায় দিলেন। প্রফেসরের বক্তব্য হচ্ছে : তিনমাস অনুসন্ধান চালিয়ে একশ' উনত্রিশটা গুহার ভিতর তাঁরা পদার্পণ করেছেন, কিন্তু মৃত্যুগহ্বর এখন পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। কায়নার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রফেসর মোটেই নিঃসন্দেহ নন। তিনি আরও জানালেন এই অঞ্চলের বিভিন্ন গুহার মধ্যে প্রাচীন গুহা-মানবের বসবাসের নিদর্শন এবং বিবিধ প্রকার খনিজবস্তুর অস্তিত্ব তাঁদের দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছে।

অথচ এই সব দিকে চোখ না দিয়ে অর্থ আর সময়ের অপব্যয় করা হচ্ছে এক অলীক বস্তুর পিছনে! অতএব এই অভিযান এখনই বন্ধ করা উচিত।

বিলও প্রফেসরকে সমর্থন জানাল, দুজনেরই মত হচ্ছে : 'চুলোয় যাক কায়না। মরীচিকার পিছনে ছুটে এমন অনেক বস্তুর সান্নিধ্য আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি, যেগুলো প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট আবিষ্কার বলে গণ্য হতে পারে।'

অকাট্য যুক্তি। তবু আস্তিলিও বন্ধুদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। আস্তিলিও শেষ চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু আমি স্বকর্ণে শুনেছি একজন মাস্বোয়ার কথা। লোকটা তার সঙ্গীকে বলছিল আমরা নাকি কখনই সেদিকে যাই নি যেদিকে আমাদের গতিবিধি মাস্বোয়া-প্রধানরা পছন্দ করে না।'

বিল বলল, 'খুব সম্ভব আমাদের অজ্ঞাতে কায়নার সামনে দিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আসল জায়গাটা ছাড়িয়ে মাস্বোয়াদের সঙ্গে আমরা অন্যদিকের গুহায় গুহায় ঘুরেছি। এই-দশ বছর ধরে ঘোরাঘুরি করলেও আমরা মৃত্যু-গহ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারব না।'

'ঠিক আছে,'—আস্তিলিও বললেন, 'যেসব গুহাতে খনিজ দ্রব্য বা ঐতিহাসিক বস্তুর নিদর্শন আছে বলে মনে হয়, তোমরা সেইসব গুহাতে সন্ধান চালিয়ে আবিষ্কারের সম্মান লাভ করো—তোমাদের আমি কায়নার পিছনে সময় নষ্ট করতে বলব না। সঙ্গে যত খুশি লোক নাও, তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু এতদিন ধরে এত কষ্ট সহ্য করার পর এত তাড়াতাড়ি আমি হাল ছাড়তে রাজী নই। অন্ততঃ আরও একমাস আমি দেখব। নির্দিষ্ট একমাসের মধ্যে যদি কোনও ফল না পাই, তাহলে কথা দিচ্ছি আমিও 'কায়না অভিযানে' ইস্তফা দেব।'

আস্তিলিওর প্রস্তাবে কারও আপত্তি হল না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বয়ং মাম্বোয়া-সর্দার আন্তিলিও সাহেবের সঙ্গী হল। ইতিপূর্বে সর্দার তাঁদের উপদেশ নির্দেশ দিয়েছে, কোথায় কোন পথে গেলে নূতন নূতন গুহার সন্ধান পাওয়া যাবে জানিয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তিগতভাবে কখনও অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয় নি। খুব সম্ভব সে বুঝেছিল, অভিযাত্রীরা শীঘ্রই তাদের দেশ ছেড়ে বিদায় নেবেন।

সর্দারের সঙ্গে কয়েকজন মাম্বোয়া অনুচর ছিল। তারা সকলেই বিভিন্ন গুহার সন্ধান দিয়ে আন্তিলিওকে সাহায্য করতে চাইল। উৎসাহের আধিক্যে আন্তিলিও সেদিন তেরটা নূতন গুহা পরিদর্শন করে ফেললেন। একদিনে এতগুলো গুহা অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে পরিদর্শন করতে পারেন নি। চোদ্দ নম্বর গুহাটার মুখে যখন আন্তিলিও পদার্পণ করলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় আগত, অস্পষ্ট অন্ধকারের প্রলেপ পড়েছে পৃথিবীর বুকে।

আন্তিলিও চোদ্দ নম্বর গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গীরা গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

গুহার মধ্যে তখন অস্পষ্ট অন্ধকার।

আন্তিলিও সচমকে দেখলেন, আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে তাঁর দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক বিরাট সর্প-দানব—পাইথন!

এত মোটা আর এত লম্বা সাপ কখনও দেখেন নি আন্তিলিও। চকিতে রাইফেল তুলে তিনি গুলি চালালেন পাইথনের মাথা উড়ে গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, কিন্তু তার মুণ্ড-হীন বিরাট শরীরটা মৃত্যুযাতনায় আন্তিলিওর চারপাশে আছড়ে পড়তে লাগল একটা অতিকায় চাবুকের মতো!

আন্তিলিও অনায়াসে ছুটে পালাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল। সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি বারবার গুলি চালিয়ে সরীসৃপের অন্তিম আস্ফালনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অজগর-জাতীয় বৃহৎ সরীসৃপের দেহ মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুক্ষণ অন্ধ

আক্ষেপে কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকিয়ে ছটফট করতে থাকে। এই সাপটাও ছিল বিরাট—তার চামড়া ছাড়িয়ে পরে যখন মাপ নেওয়া হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল পাইথনটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আটত্রিশ ফিট, এবং দেহের সবচেয়ে স্থূল জায়গাটার মাপ হচ্ছে তিন ফিট নয় ইঞ্চি!

এত মোটা, এত লম্বা একটা সর্পিল দেহ যদি চাবুকের মতো সজোরে কোনও মানুষের গায়ে আছড়ে পড়ে, তাহলে মানুষটার যে অবস্থা হয়, আত্তিলিও সাহেবেরও সেই অবস্থা হল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে ক্ষণিকের জন্য তিনি অনুভব করলেন একটা মস্ত পাহাড় যেন তাঁর দেহের উপর ভেঙ্গে পড়ছে! পরক্ষণেই তাঁর চৈতন্যকে লুপ্ত করে নামল মূর্চ্ছার অন্ধকার।···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: পথের নিশানা

জ্ঞান ফিরে এলে আত্তিলিও দেখলেন, তিনি তাঁবুর মধ্যে তাঁর নিজস্ব বিছানাতে শুয়ে আছেন এবং তাঁর কপালে কাপড় ভিজিয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রলেপ দিচ্ছে জামানি।

ক্লান্তি জড়িত স্বরে প্রফেসর আর বিলকে ডেকে দিতে বললেন আত্তিলিও। তাঁকে চোখ মেলে চাইতে দেখে মহা খুশী জামানি, একগাল হেসে সে জানাল, তাঁরা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু মাসাংগার কথা বলা উচিত নয়।

আত্তিলিওর সমস্ত সত্তা আবার ডুবে গেল গভীর নিদ্রার অন্ধকারে।···

দ্বিতীয়বার চোখ মেলে আত্তিলিও দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে একটা আলো জ্বলছে, বন্ধুরাও কাছেই আছে। প্রফেসর আত্তিলিওকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, 'আত্তিলিও যদি কথা বলার চেষ্টা না করেন তবে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে তাঁর আপত্তি নেই। অজ্ঞান হওয়ার কারণটা প্রফেসরের মুখ থেকেই

শুনলেন আত্তিলিও—সর্পদানবের দেহের প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ে একটা পাথরে মাথা ঠুকে যাওয়ার ফলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

জামানি, মাম্বোয়া-সর্দার এবং তার দলবল গুহার ভিতর রাইফেলের ঘন ঘন গর্জন শুনেই বুঝেছিল, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রথমে কেউ সাহস করে ভিতরে প্রবেশ করে নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও তিনি যখন বেরিয়ে এলেন না, তখন জামানির অনুরোধে মাম্বোয়া-সর্দার গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে রাজি হয়। গুহার ভিতর অচৈতন্য অবস্থায় আত্তিলিওকে পড়ে থাকতে দেখে তারা তাঁকে তুলে আনে এবং সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁর দেহটাকে বহন করে নিয়ে আসে তাঁবুতে। আত্তিলিও এই পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন, কিন্তু যখন প্রফেসর জানালেন, আটদিন ধরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, তখন চমকে উঠলেন আত্তিলিও—'আটদিন! বলে কি!'

'চুপ করো!'—প্রফেসর ধমকে উঠলেন, 'বিশ্রাম নাও। কথা বলবে না। সব ঠিক আছে। আমি আর বিল তোমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

আত্তিলিও হাতের উপর ছুঁচ ফোটার যন্ত্রটা অনুভব করলেন—ইনজেকসন। আলোটা নিবে গেল। দুজোড়া পা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। দুচোখের পাতায় নিদ্রার স্পর্শ সমগ্র অনুভূতি ও চৈতন্যকে অবলুপ্ত করে নামছে নিবিড় অন্ধকার···আত্তিলিও ঘুমিয়ে পড়লেন।···

একমাস পরে নভেম্বরের ২১ তারিখে প্রফেসর রায় দিলেন আত্তিলিও এইবার স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম করতে পারেন। বিগত একমাস গত্তি সাহেবকে কোন কাজ করতে দেওয়া হয় নি, দুই বন্ধু তাঁকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছিলেন। প্রফেসরের ঘোষণা শুনে মহা উৎসাহে আত্তিলিও অনেকদিন পরে ম্যাপ খুলে বসলেন। ম্যাপটার গায়ে এক জায়গায় খুব বড় করে একটা ফুটকির চিহ্ন

দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত স্থান হচ্ছে সেই গুহা, যেখানে একমাস আগে আত্তিলিও অতিকায় পাইথনের দেখা পেয়েছিলেন। চিহ্নটার পাশে কে যেন পেন্‌সিল দিয়ে লিখে রেখেছে: 'শুক্রবার ১৩ই অক্টোবর। শুভদিন। হুররে!'

'শুভদিন, না ঘোড়ার ডিম!'—আত্তিলিও বলে উঠলেন, 'আবার হুররে লিখে আনন্দ জানানো হয়েছে! কেন? এত আনন্দ কিসের?'

'ছাখো, ছাখো, ভাল করে ছাখো।' বিল গর্জন করে উঠল।

আত্তিলিও ভাল করে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের চমক—'কী!'

এইবার আত্তিলিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। সুদীর্ঘ বিশ্রামে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যে সময়টা তিনি অতিবাহিত করেছেন সেই সময়ে বিল আর প্রফেসর পরিদর্শন করেছেন গুহার পর গুহা। যেসব এলাকা দেখা হয়ে গেছে, সেখানে ফুটকির চিহ্ন। চিহ্নগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেবল পূব ও দক্ষিণেই ফুটকির ছড়াছড়ি। ফুটকিগুলো সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা জায়গাকে বৃত্তের আকারে ঘিরে ধরেছে। একটু অসমান আর খাপছাড়া হলেও ফুটকিগুলো মোটামুটি একটা সরল রেখার রূপ ধরেই এগিয়েছে এবং বৃত্তের আকারে যে স্থানটিকে ঘিরে ফেলেছে, সেটা সুগোল না হলেও বৃত্ত বটে। ঐ বৃত্তাকার স্থানটির চারপাশেই ফুটকি-চিহ্ন দেখে বোঝা যায় ঐ জায়গাটা এখন পর্যন্ত দেখা হয় নি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ফুটকিগুলো সোজা এগিয়ে এসে যেখান থেকে ঘুরে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলটাকে নির্দিষ্ট করছে, সেই চিহ্নর বেষ্টনী শুরু হয়েছে ঠিক পাইথনের গুহার পর থেকে। অর্থাৎ পাইথনের গুহা অবধি সোজাসুজি এগিয়েছেন অভিযাত্রীরা, কিন্তু উক্ত গুহার পরবর্তী স্থানে পদার্পণ করেই তাঁরা বামে ও দক্ষিণে ঘুরে গেছেন। কিন্তু কেন? হ্যাঁ, ঘুরে যাওয়ার কারণটাও বেশ স্পষ্ট। চিহ্নিত স্থানের লিখিত তারিখ দেখলেই বোঝা যায় পাইথনের গুহার পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিল আর প্রফেসরকে বাঁয়ে আর ডাইনে নিয়ে গেছে, সরলরেখা ধরে তাঁদের এগিয়ে যেতে দেওয়া

হয় নি। ক্রমাগত বাঁয়ে আর ডাইনে ঘুরেছেন তাঁরা, ফলে আবিষ্কৃত স্থানগুলোতে ফুটকির চিহ্ন পড়ে পরিত্যক্ত জায়গাটাকে বৃত্তের আকারে পরিস্ফুট করেছে ম্যাপের উপর।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ জায়গাটার উপর প্রফেসর আর বিলের উপস্থিতি পছন্দ করে না মাম্বোয়ারা, তাই তারা প্রফেসর ও বিলকে অন্যদিকে নিয়ে গেছে। আরও শোনা গেল আত্তিলিও যখন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়ে বিছানায় শুয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় বিল আর প্রফেসরকে 'সাহায্য' করার জন্য রোজই এসেছে মাম্বোয়া-সর্দার স্বয়ং—দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ঐ জায়গাটা থেকে অভিযাত্রীদের দূরে রাখার জন্য তার প্রচেষ্টা দুই বন্ধুই লক্ষ্য করেছেন। প্রফেসর ও বিলের মনোভাব বুঝতে পারে নি মাম্বোয়া-সর্দার; কারণ, সব বুঝেও কিছু-না-বোঝার অভিনয় করেছেন দুই বন্ধু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে—তার ফলেই মানচিত্রের গায়ে ফুটকি-চিহ্নে বেষ্টিত গোল জায়গাটা ধরা পড়েছে।

ম্যাপের উপর ঐ গোল চিহ্নবিহীন জায়গাটা দেখতে দেখতে আত্তিলিওর গলা থেকে একটা অস্ফুট অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এল। প্রফেসর হাসলেন, 'হ্যাঁ, ঐখানেই আছে—কোনও সন্দেহ নেই এবিষয়ে।'

দারুণ উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন আত্তিলিও। কায়না সম্বন্ধে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এখন আবার আশায় উদ্দীপনায় তাঁর রক্তে উৎসাহের জোয়ার লাগল। প্রফেসরের ওষুধের চাইতে ম্যাপের চিহ্নগুলো তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী উপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই।

পরের দিন সকালে সবাই যখন বেরিয়ে গেল, আত্তিলিও তখন জামানিকে ডেকে তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলেন। আত্তিলিও বুঝেছিলেন জামানির সাহায্য ছাড়া তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে তিনি জামানির সামনে প্রলোভনের জাল ফেলতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে জুলুজাতির স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ

ও অহঙ্কারে সুকৌশলে আঘাত দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা চলল।···
আন্তিলিও কি বোঝে না, জামানি তার দেশ জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যেতে চায়? এই হতভাগা মাম্বোয়াদের দেশ তার ভাল লাগে না সেকথাও তিনি জানেন। তিনি নিজেই কি এই দেশ পছন্দ করছেন? মোটেই না, মোটেই না। তবে কাজ শেষ না করে তো এই পাথুরে-নরক ছাড়ার উপায় নেই। জামানি যদি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চায়, তবে তারও উচিত হবে তাঁকে সাহায্য করা; কারণ কার্যসিদ্ধি হলেই তো তিনি চটপট এখান থেকে সরে পড়তে পারবেন। আর আন্তিলিওর যে 'অপেরা হ্যাট' টুপিটার মধ্যে দারুণ সব যাদুবিদ্যা লুকানো আছে বলে জামানি বিশ্বাস করে, সেই টুপিটা তো জামানিকেই উপহার দিতে চাইছেন তিনি। তবে এমন একটা মূল্যবান উপহারের বিনিময়ে তারও কি মাসাংগাকে সাহায্য করা উচিত নয়?··· কায়না-আবিষ্কারের পর আন্তিলিও নিশ্চয়ই তাকে জুলুল্যাণ্ডে নিয়ে যাবেন, সমস্ত জুলুল্যাণ্ডের মানুষ অবাক হয়ে দেখবে—হ্যাঁ, একটা পুরুষের মতো পুরুষ বটে জামানি।

জামানি প্রথমে আন্তিলিও কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারে নি, পরে যখন বুঝল, তখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে জুলু জাতির আদর্শ 'পুরুষের মতো পুরুষ' হয়ে তো মাম্বোয়াদের কায়নাকে ভয় করা চলে না, তাই বুক ঠুকে শপথ করে জামানি বলল, কায়না-অভিযানে সে মাসাংগাকে সাহায্য করবে। মাম্বোয়াদের কথাবার্তা সে শুনতে চেষ্টা করবে এবং কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য শ্রুতি-গোচর হলে সেই সংবাদ সে আন্তিলিওকে জানাবে।

আন্তিলিও অবশ্য ভালভাবেই জানতেন, কোনও গোপন রহস্যের সন্ধান পেলেও জামানি চট করে তাঁকে সংবাদ দেবে না। কিন্তু তাঁর জুলু অনুচরটি তাঁদের সবাইকে ভালবাসতো, কাজেই নানারকম ছলছুতোয় সে যে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে, সেই ভরসা তিনি রাখতেন। বিশেষ করে মাম্বোয়াদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার সুযোগ

পেলে সে হয়তো কিছুটা দুঃসাহস প্রকাশ করতে পারে। আর একটা ছোটখাট বিষয়কেও বোধহয় জামানি উপেক্ষা করবে না— 'অপেরা হ্যাট' টুপিটার প্রলোভন খুব তুচ্ছ নয় তার কাছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: ভয়াবহ পর্বত

১৯২৮ সালের ২৯শে নভেম্বর সকালবেলা আত্তিলিও ঘোষণা করলেন নিহত পাইথনের গুহাটাকে তিনি আর একবার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

পূর্বোক্ত গুহার সামনে এসে বিল ও প্রফেসর দুটো ভিন্ন পথ অনুসরণ করলেন। অজানা পথে হয়তো তাঁরা 'বিপদে পড়তে পারেন', তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার দলের সবচেয়ে বলিষ্ঠ লোকগুলোকে নিয়ে মাম্বোয়া-সর্দার তাঁদের 'সাহায্য' করতে অগ্রসর হল।

আত্তিলিও বর্তমানে পাইথনের গুহার খুব কাছাকাছি থাকবেন, অতএব তাঁকে 'সাহায্য' করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করে নি মাম্বোয়া-সর্দার। তবু সাবধানের মার নেই, তাই সর্দারের আদেশে ছয়জন মাম্বোয়া আত্তিলিওর সঙ্গে থেকে গেল। ঐ লোকগুলো ছিল দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন। নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্যই তারা আত্তিলিওর সঙ্গে ছিল। এক নজরে লোকগুলোর চেহারা জরীপ করে আত্তিলিও বুঝে নিলেন নিষিদ্ধ এলাকায় জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে এরা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না।

হঠাৎ জামানি বলে উঠল, 'ঐ যে মাসাংগা! তুমি একটা বুনো শুয়োর চাইছিলে না? ঐ গ্যাখো, একটা শুয়োরের পায়ের ছাপ।'

কোনদিনই শুয়োর মারতে চান নি আত্তিলিও সাহেব, বিশেষ করে সেই মুহূর্তে আফ্রিকার বৃহত্তম বন্যশূকরও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো না। কিন্তু তিনি জামানির অব্যক্ত ইশারা বুঝতে পারলেন। জমির উপর সত্যি সত্যিই 'ওয়ার্ট হগ' নামক বন্য

শূকরের টাটকা পায়ের ছাপ ছিল। পদচিহ্নগুলো এগিয়ে গেছে নিষিদ্ধ এলাকাটার দিকে। মাম্বোয়ারা পায়ের ছাপগুলো দেখেছিল, তারা সন্ত্রস্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। আত্তিলিও সেদিকে দেখেও দেখলেন না। এমন উৎসাহের সঙ্গে তিনি মাম্বোয়াদের ঠেলতে ঠেলতে শূকরের পায়ের ছাপগুলোর দিকে এগিয়ে চললেন যে, তারা কোনও ছুতো ধরে আপত্তি করারও সময় পেল না। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের চোখে পড়ল একটা পাহাড়। ভীষণ-দর্শন, প্রস্তর বহুল ঐ পাহাড়টা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র মাম্বোয়ারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হল ? শিকার কোথায় ?'—আত্তিলিও প্রশ্ন করলেন।

'ঐ যে।'—অনেক দূরে একটা কম্পিত ঘাসঝোপের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল একজন মাম্বোয়া।

'এগিয়ে চলো।'—জামানি হুকুম দিল।

কিন্তু কেউ আর এক পা নড়ল না।

'চলে এস আমার সঙ্গে,'—ধমকে উঠলেন আত্তিলিও, 'তোমরা কি পুরুষ মানুষ, না আর কিছু ?'

'পুরুষ-মানুষরা' এবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেল। আবার থামল। যে লোকটি আত্তিলিওর দুই নম্বর বাড়তি বন্দুকটা বহন করছিল, সে অস্পষ্ট জড়িতস্বরে কি যেন বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রাখল। তৎক্ষণাৎ তার পাশে যে লোকটি দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দড়িটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয় ব্যক্তি খাদ্য ও বিভিন্ন সরঞ্জাম-পূর্ণ থলিটাকে ফেলে ভারমুক্ত হল। পরক্ষণেই তারা একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আত্তিলিওর দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হল ছয়টি ধাবমান মনুষ্য-মূর্তি !

আত্তিলিও এইবার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। পাশে ভয়ার্ত জামানি। অদূরে পাহাড়—পাথরে পাথরে রুক্ষ,

শ্রীহীন, অনুর্বর। চারদিক চুপচাপ শান্ত। কোথাও জীবনের সাড়া নেই, একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। এই নীরবতা অস্বস্তিকর। মানুষের মন এমন জায়গায় আনন্দ পায় না। আফ্রিকার পরিবেশ এখানে প্রস্তরসজ্জায় রুক্ষ, স্তব্ধতায় ভয়ঙ্কর।

জামানি মাম্বোয়াদের ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো মাটি থেকে তুলে নিল। দারুণ আতঙ্কে তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল।

'চলে এস পাহাড়ের উপর,'—ধমকে উঠলেন আত্তিলিও, 'তুমি না জুলু-যোদ্ধা?'

মনে হল জামানি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু আত্তিলিও তার গর্বে ঘা দিয়েছেন—একটিও কথা না বলে সে সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের তলায় অনেকগুলো বড় বড় পাথর ছিল। পাথরগুলোর ভিতর থেকে একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের সন্ধান পাওয়া গেল। ঐ পথ বেয়ে উপরে উঠে আত্তিলিও দেখলেন, তাঁরা দুজন যেখানে এসে পৌঁছেছেন, সেটা হচ্ছে পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত একটা প্রশান্ত প্রশস্ত সমতল জায়গা।

সমতল জায়গাটার একপাশে দুটো মস্ত পাথর আত্তিলিওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

পাথর দুটোর মাঝখানে দেখা গেল একটা গর্ত। গর্তটা প্রায় গোলাকার, চওড়ায় সেটা বারো ফিটেরও বেশী।

কায়না?...

কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু আত্তিলিওর দৃঢ় ধারণা হল, এই গর্তটাই কায়না। নিজের চোখকে তিনি প্রায় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—মাসের পর মাস যার জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন অভিযাত্রীরা, নিদারুণ বিপদের মুখে প্রাণ বিপন্ন করেছেন বারংবার—সেই মৃত্যু-গহ্বর আজ আত্তিলিওর পায়ের তলায়!

একবার উঁকি দিয়ে গর্তের ভিতর দৃষ্টিকে চালনা করলেন আত্তিলিও। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর

থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ তাঁর নাকে ধাক্কা মারল। আত্তিলিও সেই গন্ধটা সহ্য করতে পারলেন না, পিছিয়ে এলেন।

গহ্বরের নিবিড় অন্ধকারের ভিতর কিছুই চোখে পড়ছে না। কিন্তু গর্তটা কি খুব গভীর? আত্তিলিও গর্তের ভিতর একটা ছোট পাথর ছুঁড়লেন। পাথরটা এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে অনেকগুলো শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করল, কিন্তু একেবারে তলা থেকে পাথরটার পতনজনিত শব্দ শুনতে পেলেন না তিনি। এবার একটা বড় পাথর তিনি ছুঁড়ে দিলেন। একটা অস্পষ্ট শব্দ গর্তের তলা থেকে ভেসে এল। আত্তিলিও বুঝলেন পাথরটা নীচে পৌঁছল।

'জামানি,'—আত্তিলিও বললেন, 'এইবার তুমি নিশ্চয়ই টুপিটা পাবে।'

নিতান্ত কর্তব্য বোধেই জামানি ধন্যবাদ দিল। তার চোখে-মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন আত্তিলিও দেখতে পেলেন না।

জামানির দোষ নেই। স্বয়ং আত্তিলিও সাহেবই কি খুব উৎসাহ বোধ করছিলেন? ঐ অন্ধকার গহ্বরের ভিতর কোন্ অজ্ঞাত বিভীষিকা লুকিয়ে আছে কে জানে! এটাই যে কায়না এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে একটা রহস্যময় গহ্বরের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

সাফল্যের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন আত্তিলিও। বর্তমানে তাঁর অবস্থাটা হল, যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়!' এই মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য কি হতে পারে সেটাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। একবার ভাবলেন শূন্যে রাইফেলের আওয়াজ করে প্রফেসর আর বিলকে ডাকলে কেমন হয়? তারপর মনে হল, ওরা এখন কোথায় আছে কে জানে! যদি অনেক দূরে থাকে, তাহলে তো গুলির শব্দ শুনতেই পাবে না। কিংবা শুনতে পেলেও আত্তিলিও যে তাদের ডাকছেন এই কথাটা বুঝতে পারবে কি? গুলি তো কত কারণেই

চালানো হয়। তারপর মাম্বোয়া-সর্দার? সেও তো এক সমস্যা। বিল আর প্রফেসরের সঙ্গে মাম্বোয়া-সর্দারও তো তার দলবল নিয়ে আসবে। তারা যে সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে বিদেশীদের মৃত্যু-গহ্বরের ভিতর ঢুকতে দেখে, এমন তো—মনে হয় না!

অবশ্য এতসব ভাবনা-চিন্তা না করে আন্তিলিও তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন, এবং পরের দিন তাদের নিয়ে এখানে চলে আসতে পারতেন অনায়াসে। এই সহজ উপায়টা যে তার মাথায় আসে নি, তা নয়। কিন্তু উপায়টা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেটাকে নাকচ করেছেন। কি বলবেন তিনি বন্ধুদের কাছে? মৃত্যু-গহ্বর আবিষ্কার করেও তার ভিতর তিনি একা প্রবেশ করতে সাহস পান নি? বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছেন? এমন কথা বলতে পারেন না মহাযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তি।

অতএব আন্তিলিও ঠিক করলেন, ঐ গহ্বরের ভিতর ঢুকে আজই তিনি ভিতরটা দেখবেন। দড়িটাকে তিনি হস্তগত করলেন, তারপর গর্তের মুখে অবস্থিত প্রকাণ্ড পাথর দুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে দড়িটা বাঁধলেন। দড়ির একপ্রান্ত পাথরের সঙ্গে বাঁধা হল, অপর প্রান্তটা তিনি বাঁধলেন নিজের কোমরের সঙ্গে। যে থলিটার মধ্যে খাবার-দাবার এবং নানাধরনের যন্ত্রপাতি ছিল, সেটার ভিতর থেকে সবকিছু তিনি বের করে ফেললেন। তারপর সেই থলিটা বুকে ঝুলিয়ে তিনি প্রস্তুত হলেন মৃত্যু-গহ্বরের ভিতর অবতরণ করার জন্য। থলিটা অবশ্য একেবারে শূন্যগর্ভ ছিল না, দুটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুকে থলির মধ্যে ভরেছিলেন আন্তিলিও—টর্চ এবং পিস্তল।

জামানিকে ডেকে আন্তিলিও বললেন, সে যেন কোনও কারণেই স্থানত্যাগ না করে। তারপর তিনি তাকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে দড়ি ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে গর্তের ভিতর নামাতে হবে। জামানির ওষ্ঠধর নড়ে উঠল। কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। সম্মতি-সূচক 'ইয়েস, মাসাংগা,' কথাটা তার ঠোঁটদুটির ভিতরেই জমে গেল,

উচ্চারিত হল না। দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল জামানি, তবু সে নির্দেশ-অনুযায়ী দড়িটা ধরল। সাবধানে, আস্তে আস্তে, তাকে দড়ি ছাড়তে বললেন আভিলিও। লাটাই থেকে যেভাবে সুতো ছেড়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, ঠিক সেইভাবেই জামানিকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘুড়ি ওঠে উপরদিকে, এখানে আত্তিলিও নামছেন নীচের দিকে এবং সুতোর স্থান নিয়েছে জামানির হাতের দড়ি আর লাটাইয়ের স্থান গ্রহণ করেছে একটা মস্ত পাথর।

খুব সন্তর্পণে আত্তিলিও নামতে শুরু করলেন। গর্তের মুখে পা রাখতে না রাখতেই কয়েকটা পাথর তাঁর পায়ের ধাক্কায় গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়ল সশব্দে। সেই শব্দে সাড়া দিয়েই যেন অন্ধকার গহ্বরের ভিতর থেকে কি একটা বস্তু ছুটে এল। আর পরক্ষণেই—

পরক্ষণেই আত্তিলিওর মুখের উপর পড়ল এক প্রচণ্ড থাপ্পড়! সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটিয়ে এক তীব্র চিৎকার!

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ মৃত্যু-বিভীষিকা

মুখের উপর সজোরে চপোটাঘাত পড়তেই আত্তিলিও চোখ বন্ধ করে ফেললেন এবং তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন দড়িবাঁধা পাথরটাকে।

একটি মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে রইলেন তিনি, তারপর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখলেন, আক্রমণকারী জীবটি হচ্ছে মস্ত বড় একটা নিশাচর পাখি! অন্ধকার গহ্বরের ভিতর থেকে উড়ে আসার সময়ে তাঁর মুখের উপর পাখিটার ডানার ঝাপটা লেগেছিল। অন্ধকারে অভ্যস্ত নিশাচর দিনের আলোর মধ্যে এসে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছিল, গহ্বরের কাছেই একটা শুকনো গাছের ডালপালার মধ্যে চুপ করে বসেছিল পাখিটা।

এই ঘটনাটা অবশ্য আত্তিলিওর পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। পাখিটা তাঁকে ভবিষ্যতের ভয়াবহ সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধান করে

করে দিল—জামানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে তাঁর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে, এই ঘটনায় তার প্রমাণ পেলেন আত্তিলিও।

জামানির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, সে দড়ি ছেড়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছে! হাত বাড়িয়ে পাথরটা না ধরলে তাঁর দেহটা ছিটকে পড়তো গহ্বরের ভিতর এবং তলদেশে পতিত হয়ে অথবা পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তাঁর অবস্থা যে হতো নিতান্ত শোচনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আত্তিলিও ঠিক করলেন, গর্তের ভিতর নামার সময়ে তিনি আর জামানির উপর নির্ভর করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবেন না। জামানিকে ভূমিশয্যা ত্যাগ করতে বললেন তিনি। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে মাথা তুলল জামানি, তারপর বিস্ফারিত দুই চক্ষুর ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল।

'ভ্-ভ্ভূত!' সহসা আর্তনদে করে উঠল জামানি, তার ভীত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পুর্বোক্ত নিশাচর পক্ষীর উপর!

'ভূতের নিকুচি করেছে!'—বলে আত্তিলিও একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন। মস্ত বড় পাখিটা ডানা ঝটপট করে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'কি? দেখেছ?'

আত্তিলিও জামানির মুখের দিকে তাকালেন। জামানি মাথা নেড়ে জানাল, দেখেছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখেই আত্তিলিও বুঝলেন, উড়ন্ত জীবটির 'পক্ষীত্ব' সম্বন্ধে জামানির সন্দেহ দূর হয় নি। খুব সম্ভব সে ভাবছিল, ওটা পাখি না হয়ে একটা ছদ্মবেশী প্রেতাত্মাও হতে পারে!

আত্তিলিও আর জামানির সঙ্গে কথা বললেন না, নেমে পড়লেন গহ্বরের ভিতর। এইবার অবশ্য তিনি দড়িটাকে জামানির হাতে সমর্পণ করেন নি; খুব সাবধানে ঝুলতে ঝুলতে তিনি নামতে শুরু করলেন দড়ি ধরে। যে পাথরটার সঙ্গে আত্তিলিওর দেহ-সংলগ্ন

দড়িটা বাঁধা ছিল, সেই পাথরটা ছিল খুবই গুরুভার, অতএব তাঁর দেহের ভারে পাথরটার স্থানচ্যুত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

আত্তিলিও নামছেন, নামছেন আর নামছেন······উপর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ আলোর আভাসও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল ; তাঁর মাথার উপর, পায়ের নীচে, সামনে-পিছনে চতুর্দিকে বিরাজ করছে এখন সীমাহীন অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার···

গুহার প্রস্তর-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসা একটা পাথরে আত্তিলিওর পা ঠেকল। পাথরটা খুব ধারাল, কিন্তু সেটার উপর দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে নির্ভব করা যায়। আত্তিলিও কিছুক্ষণ সেই পাথরটার উপর পা রেখে বিশ্রাম করলেন, তারপর আবার দড়ি ধরে অবতরণ-পর্ব······

কয়েকটা আলগা পাথর আত্তিলিওর দেহের ধাক্কা খেয়ে সশব্দে ছিটকে পড়ল, কয়েকটা নিশাচর পক্ষী ডানা মেলে উড়ে গেল, তাদের ডানার শব্দ ভেসে এল আত্তিলিওর কানে।

গহ্বরেব প্রস্তর-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরগুলো পা দিয়ে অনুভব করছিলেন আত্তিলিও, এবং মাঝে মাঝে ঐ পাথরগুলোর পর পা রেখে তিনি ক্লান্ত বাহু দুটিকে বিশ্রাম দিচ্ছিলেন। পর পর চারটে পাথরের উপর বিশ্রাম নিয়ে পঞ্চম পাথরটির উপর অবতীর্ণ হলেন আত্তিলিও। একহাতে দড়ি আঁকড়ে অন্য হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরে তিনি গুহার তলদেশ আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গর্তের চারিপাশের দেয়াল থেকে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর বেরিয়ে এসে দেয়ালটাকে এমন অসমান করে তুলেছে যে, টর্চের আলো সেই প্রস্তরের বেষ্টনী ভেদ করে গুহার তলায় পৌঁছাতে পারল না। আত্তিলিও সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন : পঁচাত্তর ফিট দীর্ঘ রজ্জুর দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে, উপর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বরে সাড়া দিয়ে জামানির উত্তরের রেশ অস্পষ্ট হয়ে দুজনের মধ্যে এক ভয়াবহ দূরত্বের আভাস দিচ্ছে, কিন্তু গহ্বরের তলায় পা দেওয়া তো দূরের কথা, তলদেশ এখনও রয়েছে তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে! গর্তটা নিশ্চয়ই

অতল অসীম নয়, কিন্তু এই ভুতুড়ে গহ্বরের গভীরতা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ? কোথায়, কতদূরে গেলে পাওয়া যাবে নীচের মাটি ?

হঠাৎ আত্তিলিওর পায়ের তলায় পাথরটা নড়ে উঠল। চমকে উঠে তিনি দড়িটা চেপে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না— পাথরটা তাঁর দেহের ভারে স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে আত্তিলিও সাহেবও ছিটকে পড়লেন সীমাহারা শূন্যতার মাঝে !

তাঁর দেহটা দেয়াল থেকে দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে নীচের দিকে পড়তে লাগল, গুহার গাত্র-সংলগ্ন ধাবালো পাথরগুলো ধারালো ছুরির মতোই নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে দংশন করতে লাগল বারংবার, হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আত্তিলিওর দেহটা স্থির হয়ে গেল। পঁচাত্তর ফিট লম্বা দড়ির দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে গেছে। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে লাগলেন আত্তিলিও, তাঁর মনে হল, কোমরে-বাঁধা দড়িটা তাঁকে দুটুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে !

আত্তিলিও সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে একটা আঠার মতো ঘন চটচটে বস্তুর উষ্ণ অস্তিত্ব অনুভব করলেন : রক্ত। ধারালো পাথরগুলো খোঁচা মেরে মেরে তাঁর পতন উন্মুখ শরীরটাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। কিন্তু রক্তাক্ত ক্ষতগুলোর চাইতেও তাঁকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে দড়িটা। কোমরের উপর, পাঁজরের দুপাশে শক্ত দড়ি যেন কেটে কেটে বসেছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আত্তিলিওর শরীরটা এখনও আস্ত আছে, ভগ্নাংশে পরিণত হয় নি। বুকের সঙ্গে বাঁধা থলির ভিতর থেকে টর্চটা বার করে আত্তিলিও সেটাকে জ্বেলে ফেললেন এবং চারিদিকে দৃষ্টি চালনা করে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

গুহাটা মোটামুটি বৃত্তাকার। তার আনুমানিক ব্যাস প্রায় ছত্রিশ ফিট। গুহার ছাদ এবং ভূমির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে দোল খাচ্ছেন আত্তিলিও ; উপরোক্ত দুটি স্থানের দূরত্ব তাঁর দেহের থেকে প্রায় দশ-বারো ফিট হবে। গুহার নীচে মাটি প্রায় দেখা যাচ্ছে না, অগণিত নরকঙ্কাল ও অস্থিময় নরমুণ্ডের আবরণে গুহার তলদেশের মৃত্তিকা প্রায় অদৃশ্য। অস্থিপঞ্জরগুলো কোথাও

ধবধবে সাদা, কোথাও বা সময়ের স্পর্শে হলুদ হয়ে এসেছে।

ঝুলতে ঝুলতে আর দুলতে দুলতে আত্তিলিও টর্চের আলোটাকে গুহা-গহ্বরের কিনারাতে ফেললেন।

গুহার দেয়াল যেখানে নেমে এসে গুহা ভূমিকে স্পর্শ করেছে, সেইখানে মেঝের উপর এক জায়গায় আত্তিলিওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল : হাড়ের স্তূপের মধ্যে কিছু যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে !

সচল বস্তুগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন আত্তিলিও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঐ জায়গাটা তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ দারুণ আতঙ্কে তাঁর শরীরের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল ! স্তূপীকৃত অস্থি-পঞ্জর আর কঙ্কাল-করোটির মধ্যে বিচরণ করছে কয়েকটা কেউটে সাপ! আত্তিলিও গুণে দেখলেন, সেখানে অবস্থান করছে সাত-সাতটি বিষধর সরীসৃপ।

টর্চের আলোতে বিরক্ত হয়ে কেউটেগুলো অনধিকার প্রবেশকারীকে সন্ধান করছে। তাদের দীর্ঘ মসৃণ দেহ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। আবার খুলে খুলে যাচ্ছে।

সাপগুলো বুঝতে পারল, তাদের বিরক্তির কারণটি কোথায় অবস্থান করছে। শত্রুর নাগাল না পেয়ে হিংস্র আক্রোশে ফণা তুলে তারা দুলতে লাগল—একবার পেলে হয় !

অনেকের ধারণা, কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই কেউটে সাপের দেখা পাওয়া যায়। ঐ ধারণা ভুল। কেউটে পরিবারের অন্তর্গত অন্ততঃ চারটি বিভিন্ন জাতের সাপ আফ্রিকাতে বাস করে। উপরোক্ত ভয়াবহ তথ্য আত্তিলিও সাহেবের অজ্ঞাত ছিল না; তিনি একথাও জানতেন যে, দেহের যে কোনও স্থানে কেউটের ছোবল পড়লে তাঁকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকের যাত্রী হতে হবে।

আত্মরক্ষার জন্য তিনি যা করলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। বাঁ হাতের জ্বলন্ত টর্চ ঘুরিয়ে তিনি সাপগুলোর উপর আলো ফেললেন এবং ডান হাতের পিস্তল

থেকে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলেন। পরপর ছয়বার অগ্নি-উদ্গার করে গর্জে উঠল পিস্তল, প্রত্যেকটি গুলি অভ্রান্ত লক্ষ্যে ছয়টি সরীসৃপের দেহ বিদ্ধ করল—একটি গুলিও ব্যর্থ হল না।

সাত নম্বর কেউটের দিকে ফাঁকা পিস্তলটা ছুঁড়ে মারলেন আত্তিলিও, সাপটা চট করে গুহার গায়ে একটা ফাটলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হল।

দড়িটা আত্তিলিওর কোমরে কেটে বসছিল, সেই যন্ত্রণা আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। 'যা থাকে বরাতে' মনে করে শরীরটাকে রজ্জুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি লাফিয়ে পড়লেন গুহার মেঝের উপর। সাপগুলো তখনও মৃত্যুযাতনায় ছটফট করছিল, আত্তিলিও জুতো-পরা পায়ের লাথি চালিয়ে সেগুলোকে নিরাপদ ব্যবধানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরই একটা অস্থিময় নরমুণ্ডের উপর হোঁচট খেয়ে তিনি পড়ে গেলেন।······

কতক্ষণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন সে কথা আত্তিলিও নিজেও বলতে পারবেন না। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি ধীরে ধীরে আহত ও রক্তাক্ত শরীরের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করলেন। উপর থেকে ছিটকে পড়ার সময়ে পাথরের খোঁচা লেগে যেসব জায়গা কেটেকুটে গিয়েছিল, সেই ক্ষতস্থানগুলোর উপর তিনি 'ব্যাণ্ডেজ' বেঁধে ফেললেন। অবশ্য সেইজন্য তাঁকে পরনের শার্টটা ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। গহ্বরের গায়ে যে ফোকরটার ভিতর দিয়ে সাত নম্বর সাপটা অন্তর্ধান করেছিল, সেই ফুটোটার কাছে গিয়ে আত্তিলিও লক্ষ্য করলের বাইরের বাতাস পূর্বোক্ত গর্তটার ভিতর দিয়ে সশব্দে গুহার ভিতর প্রবেশ করছে। আত্তিলিও এইবার বুঝলেন, আশী ফিট গভীর এই গহ্বরের ভিতর সাপগুলো কোন্ পথে এসেছে। স্তূপীকৃত অস্থি-পঞ্জরের ভিতর থেকে একটা হাড় নিয়ে তিনি চটপট ঐ ফোকরটার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

এতক্ষণে আত্তিলিও সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁর দেহে রক্ত চলাচল করছে স্বাভাবিকভাবে। এই ভয়ানক গহ্বরটা যে 'কায়না', এ

বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই তাঁর। মাম্বোয়া-সর্দারদের আদেশে এই সুগভীর গহ্বরের মধ্যে অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হতো। অপরাধের গুরুত্ব সব সময় খুব বিবেচ্য নয়, মাম্বোয়া-সর্দার বা মাতব্বরদের অপ্রীতিভাজন হলেই উক্ত ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়া হতো কায়নার গর্ভে। মাম্বোয়ারা এই রীতি পছন্দ করতো না, কিন্তু তারা জানতো কেউ যদি শ্বেতাঙ্গদের কাছে মৃত্যু-গহ্বরের সন্ধান দেয়, তবে মাম্বোয়া-সর্দারদের আদেশে সেই ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। সেইজন্যই তারা মুখ খুলতো না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু যখন কাছে এগিয়ে এসেছে তখনই তারা মুখ খুলতে চেয়েছে। আত্তিলিওর মনে পড়ল নিগ্রো পুলিসম্যান ও স্থানীয় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির কথা। মরার আগে তারা মৃত্যু-গহ্বরের রহস্য ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল, কারণ তারা বুঝেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মাম্বোয়া-সর্দারদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার আগেই মৃত্যুর স্পর্শে তাদের জিহ্বা হয়ে যায় স্তব্ধ। ঐ সব ঘটনাগুলো বার বার আত্তিলিওর মনে পড়তে লাগল।

মৃত্যু-গহ্বরের ভিতর যেসব মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কথা মনে হতেই শিউরে উঠলেন আত্তিলিও। অনাহারে আর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করেছে ঐসব হতভাগ্যের দল, তিল তিল করে শুকিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মৃত্যুব দিকে। সেইজন্যই এই গুহার নাম দেওয়া হয়েছে 'কায়না' অর্থাৎ 'যাতনাদায়ক মৃত্যু-গহ্বর'।

নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য যুগ-যুগ ধরে মাম্বোয়া-সর্দাররা এই প্রথা বাঁচিয়ে রেখে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। মাম্বোয়া জাতির মাতব্বরদের এই নৃশংসতায়. আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় সর্বদেশে সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের একদল লোক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য।

আত্তিলিও হঠাৎ চমকে উঠলেন: এসব তিনি কি ভাবছেন? মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা না ভেবে তাঁর নিজের কথাই এখন চিন্তা করা উচিত। মাম্বোয়াদের মধ্যে প্রচলিত একটা ভয়ানক প্রবাদ বাক্য তাঁর মনে পড়ল—'এখানে যে প্রবেশ করে, তার উদ্ধারের আশা নেই!'

আত্তিলিওর মনে হল, মূর্খের মতো অন্য মানুষের দুঃখের কথা ভেবে তিনি মূল্যবান সময়ের অপচয় করছেন। যদি এই গহ্বরের বাইরে তিনি না যেতে পারেন, তবে তাঁর দেহের কঙ্কালটিও একদিন এই গুহার অস্থিস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকবে। আত্তিলিও এইবার মৃত্যু-গহ্বরের গর্ভ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

দড়িটা উপরে ঝুলছিল। আত্তিলিও সেটাকে লক্ষ্য করে লাফ মারলেন। বৃথা চেষ্টা, লাফিয়ে ঐ দড়িটাকে করায়ত্ত করা সম্ভব নয়। তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন, প্রতিধ্বনি তাঁকে বিদ্রূপ করল, উপর থেকে জামানির কণ্ঠস্বরে কোন উত্তর এসে পৌঁছাল না তাঁর কাছে।

আত্তিলিও এইবার অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। অনেকগুলো পাথর আর নরকঙ্কাল টেনে জড় করলেন দড়িটার নীচে, তারপর ঐ পাথর আর হাড়ের স্তূপের উপর আরোহণ করে এক সময়ে দড়িটাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এখনও ঝামেলা অনেক--দড়ির শেষ প্রান্তে যে গিঁট আছে, সেটাকে না খুললে চলবে না। ইতিমধ্যে টর্চের ব্যাটারী শেষ হয়ে এসেছে, আলোটা কাঁপতে শুরু করল। আত্তিলিওর সমস্ত শরীর তখন অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, কেবল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁকে দু পায়ের উপর খাড়া করে রেখেছিল। কম্পিত হস্তে দড়ির গিঁটটা এক সময়ে খুলে ফেললেন আত্তিলিও। পিস্তল আর টর্চ ব্যবহারের যোগ্য ছিল না, তাই সে দুটির পরিবর্তে কয়েকটা হাড়ের টুকরো আত্তিলিও তাঁর থলির মধ্যে ভরে নিলেন। শ্রান্ত দেহে অনেকটা দূরত্ব তাঁকে দড়ি ধরে অতিক্রম করতে হবে, ঐ

অবস্থায় হাড়গোড় দিয়ে ওজন বাড়িয়ে নিজেকে ভারগ্রস্ত করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝেও মৃত্যু-গহ্বর থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি আত্তিলিও। জীবনের আশা তিনি প্রায় ত্যাগ করেছিলেন, তবু যদি জীবিত অবস্থায় কায়নার বাইরে পদার্পণ করতে পারেন, তবে ঐ হাড়গোড়গুলো বিল আর প্রফেসরের সামনে প্রমাণস্বরূপ দাখিল করতে পারবেন ভেবেই আত্তিলিও বাড়তি ওজনের ঝঞ্ঝাট বহন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

হাত আর পায়ের সাহায্যে যেভাবে মানুষ সাধারণতঃ দড়ি বেয়ে উপরে ওঠে, সেইভাবে চেষ্টা করলে খুব সম্ভব আত্তিলিও ব্যর্থ হতেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত বাহু ও পায়ের মাংসপেশী সুদীর্ঘ রজ্জুপথে বেশীক্ষণ তাঁর দেহভার বহন করতে পারতো কি না সন্দেহ। তাই আত্তিলিও একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। দড়িটাকে তিনি দক্ষিণ উরুর তলা দিয়ে চালিয়ে দিলেন, তারপর যে অংশটা তিনি অতিক্রম করছিলেন, দড়ির সেই অংশটুকু ডান দিকের উরুর তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দক্ষিণ বাহুর ঊর্ধাংশের উপর ফেলে দিচ্ছিলেন। এইভাবে যে দড়ির বেষ্টনী তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে ডান পা ঝুলিয়ে রেখে বাঁ পা দিয়ে গুহার দেয়ালে বেরিয়ে-আসা পাথরের মাঝে মাঝে ধাক্কা মেরে উপরে উঠছিলেন আত্তিলিও। দোদুল্যমান রজ্জুর দুটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে এবং আত্তিলিওর দুই পায়ের মাঝখানে ঘর্ষিত হয়ে শূন্য পথে ভাসমান দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছিল ; ফলে ক্লান্ত শরীরটা অল্প আয়াসেই ঝুলিয়ে রেখে মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন তিনি।······

তবু মাঝে মাঝে ক্লান্ত মুঠির বাঁধন খুলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, মাঝে মাঝেই দড়ির উপর শিথিল হয়ে এসেছে হাতের আঙুলগুলো, কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়েন নি আত্তিলিও, শক্ত করে বারবার আঁকড়ে ধরেছেন দড়িটাকে ·····

গহ্বরের উপর দিকে তিনি যত উঠছিলেন, নিরেট অন্ধকার ততই হাল্কা হয়ে গহ্বরের বহির্দেশে উজ্জ্বল সূর্যালোকের অস্তিত্ব

ঘোষণা করছিল। সেই আলোর আভাসই প্রেরণা দিয়েছে, শিথিল আঙুলের বাঁধন খুলে যেতে আবার দড়িটাকে চেপে ধরেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে।

আত্তিলিও উপরে উঠতে লাগলেন অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে······

অবশেষে এক সময় তিনি গহ্বরের মুখে এসে পৌছালেন। মাথাটা গর্তের বাইরে ঠেলে দিয়ে সামনে দৃষ্টিপাত করলেন: ভগবাকে ধন্যবাদ, জামানি যথাস্থানেই অবস্থান করছে।

আত্তিলিওকে দেখামাত্রই জামানির দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, ওষ্ঠাধর হল বিভক্ত এবং সর্বশরীরে জাগল কম্পিত শিহরণ।

"সাহায্য করো,"—আত্তিলিও ভগ্নস্বরে বললে, "তাড়াতাড়ি করো!"

জামানি অবরুদ্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, "মাসাংগা! তোমার নিজের আত্মা!"

আত্তিলিওর হাত ধরার চেষ্টা না করে সে ধপাস করে মাটির উপর পড়ে গেল।

আত্তিলিও পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে গহ্বরের মুখে দড়িবাঁধা পাথরটা চেপে ধরে পতন থেকে আত্মরক্ষা করলেন। তারপর শেষ শক্তি দিয়ে নিজের পতন-উন্মুখ দেহটাকে টেনে আনলেন গহ্বরের বাইরে। শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীরে অতি কষ্টে শ্বাস টানতে টানতে আত্তিলিও শুনলেন জামানির আর্তনাদ—"মাসাংগা! তুমি মরে গেছ! আমি জানি, তুমি মরে গেছ! মরে তুমি ভূত হয়েছ!—তবে কেন থলির মধ্যে তোমার মুণ্ডু আর হাড়গুলো নিয়ে এলে আমার কাছে! মাসাংগা! আমি তোমার বিশ্বস্ত অনুচর, আমার সঙ্গে তোমার এ কি ব্যবহার, মাসাংগা!"

আত্তিলিও হাসেন নি!

হেসে ওঠার ক্ষমতাও তাঁর তখন ছিল না।

সৈনিকের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা

প্রথম পরিচ্ছেদ: অর্ধেক মানব আর অর্ধেক প্রেত

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি নামক মিত্রপক্ষের জনৈক সেনাধ্যক্ষ আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্‌যোগী হন। ঐ কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু—'প্রফেসর' ও 'বিল'। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ফরাসী বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয় মানুষটি হচ্ছে আমেরিকার এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রিয় দুঃসাহসী যুবক। বন্ধু দুটিকে নিয়ে যে অঞ্চলে প্রথম পদার্পণ করলেন আত্তিলিও, সেই জায়গাটি হল আফ্রিকার অন্তর্গত উত্তর রোডেশিয়া। পূর্বোক্ত স্থানে 'কায়না' নামে এক ভয়াবহ মৃত্যুগহ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে অভিযাত্রীরা স্থানীয় সরকারকে অবাক করে দিয়েছিলেন। কায়নার গহ্বর থেকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, করোটি, পাথরের গয়না এবং জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। ঐসব জিনিস উপহার হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম নীচে দেওয়া হল:

গভর্নমেণ্ট অব নর্দার্ণ রোডেশিয়া, আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, রয়্যাল অ্যানথ্রপলজিক্যাল মিউজিয়াম অব ফ্লোরেন্স এবং জোহানেস্‌বার্গের উইটওয়াটারস্‌র্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর রোডেশিয়াতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে সাফল্য অর্জন করার ফলে অভিযাত্রীদের সামনে দক্ষিণ রোডেশিয়ার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। দক্ষিণ রোডেশিয়ার সরকার সাধারণতঃ বিদেশীদের প্রবেশ করার অনুমতি দেন না, কিন্তু অভিযাত্রীদের বিভিন্ন গবেষণা-কার্যের সাফল্যে খুশী হয়েই পূর্বোক্ত গভর্নমেণ্ট নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিবরণ পাঠকদের কাছে নীরস লাগবে বলে আত্তিলিও ঐসব বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব এখানে

পরিবেশন করেন নি, লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দক্ষিণ রোডেশিয়াতে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন আত্তিলিও। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, সেখানে গিয়ে এক বিপদজনক নাটকের মধ্যে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ভয়াবহ নাটকের স্মৃতি আত্তিলিওর মানসপটে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে থাকবে। সেই বন্যনাটকে একাধিক 'ভিলেন' বা খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল প্রকাণ্ড এক নরখাদক সিংহ, এক শয়তান যাদুকর এবং ক্রোধে উন্মত্ত একশ জুলুযোদ্ধা!

নায়কের ভূমিকায় ছিল পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এক সুদর্শন জুলুযোদ্ধা, নায়িকার স্থান নিয়েছিল এক ষোড়শী জুলুবালিকা।

উল্লিখিত প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়া কিছু কিছু 'এক্সট্রা' অর্থাৎ অতিরিক্ত চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিকে জমিয়ে তুলেছিল, যেমন— প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জুলুসর্দার, নরমাংস-লোলুপ শত শত সিংহ, এবং আত্তিলিও, বিল, প্রফেসর প্রভৃতি অনিচ্ছুক অভিনেতার দল।

মূল নাটকে আত্তিলিওর ভূমিকা ছিল খুবই ছোট, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি মানুষের জীবনমরণ নির্ভর করছিল তাঁর অভিনয়ের সাফল্যের উপর; এবং ঐ দুটি মানুষের একজন হলেন স্বয়ং আত্তিলিও! তবে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তিনি ঘাবড়ে যান নি, বেশ ভালো হয়েছিল তাঁর অভিনয়। না, ভালো বললে কিছুই বলা হয় না—এমন চমৎকার, এমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল তাঁর অভিনয় যে, সমস্ত ঘটনা শোনার পর মনে হয় সৈনিকের পেশা গ্রহণ না করে পেশাদার অভিনেতার বৃত্তি অবলম্বন করলে অনেক বেশী যশ ও খ্যাতির অধিকারী হতে পারতেন কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি।

কম্যাণ্ডার সাহেব প্রথমে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাইফেল হাতেই

আসরে নেমেছিলেন, কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে অস্ত্রত্যাগ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন যাদুকরের ভূমিকায়—রাইফেলের পরিবর্তে তখন তাঁর হাতে ছিল 'ম্যাজিকের বাক্স'! সে সব ঘটনার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হবে।

পূর্বোক্ত নাটকের বিবরণী দেওয়ার আগে যখন এত কথাই বললাম, তখন যে পটভূমির উপর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, সেই রঙ্গমঞ্চটি সম্বন্ধেও পাঠককে অবহিত করা প্রয়োজন।

মঞ্চটি ছিল ঐ অভিনব নাটকেরই উপযুক্ত—আয়তনে বিশাল এবং চমকপ্রদ দৃশ্য সজ্জায় সুশোভিত। জুলুল্যাণ্ডের উত্তর অংশে বিরাজমান ইনিয়াতি পর্বতমালার অরণ্যসজ্জিত বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল উল্লিখিত নাটকের 'স্টেজ' বা মঞ্চ।

উত্তর রোডেশিয়া ত্যাগ করে এগারজন নিগ্রো অনুচর নিয়ে অভিযাত্রীরা ইনিয়াতি পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হলেন। পূর্বোক্ত নিগ্রোদের সংগ্রহ করেছিল জামানি নামক আত্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর ও রাঁধুনী। সকলেই জানত যে, তাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে জুলুল্যাণ্ড।

জামানি জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসী, অতএব স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেলে তার পক্ষে খুশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ভয়ানক সমস্যা তাকে এমনভাবে বিব্রত করে তুলেছিল যে, দেশে ফেরার আনন্দ সে প্রথমে উপভোগ করতে পারেনি। সমস্যাটা হচ্ছে এই:

আত্তিলিওকে কায়নার ভয়াবহ গহ্বর থেকে উঠে আসতে দেখেছিল জামানি, আর তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়েছিল প্রভুর মতো দেখতে ঐ 'জীবটি' হচ্ছে 'প্রভুর প্রেতাত্মা'; কারণ, একটা নিঃসঙ্গ মানুষ মৃত্যুগহ্বরের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে আবার জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে, এমন অসম্ভব কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়··· কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার জামানির মনে খটকা লাগল—একটা আস্ত ভূতের পক্ষে নিরেট রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সব সময় চলাফেরা করা কি সম্ভব?······আবার ঘর্মাক্ত হল জামানির মস্তিষ্ক·· ···

অবশেষে বিস্তর চিন্তা করে, বিস্তর মাথা ঘামিয়ে, আসল ব্যাপারটা সে ধরে ফেলল—আন্তিলিও হচ্ছেন, 'অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক প্রেত!' না হলে, কায়নার মতো ভয়াবহ মৃত্যুগহ্বরের ভিতর থেকে একটা আস্ত মানুষ কি কখনো জ্যান্ত অবস্থায় ফিরতে পারে?……

যাই হোক, 'প্রেত-মানুষ' যে তার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে তাকে মাতৃভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে এই চমকপ্রদ তথ্যটি আবিষ্কার করার পরই মনের মেঘ কেটে গেল, উৎফুল্ল হয়ে উঠল জামানি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জুলুদের দেশে আন্তিলিও

আন্তিলিও তাঁর অভিযাত্রীদল নিয়ে জুলুল্যাণ্ডের ভিতর এসে পৌঁছালেন। তিনি জানতেন দলের নেতা হিসাবে দলীয় নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব এখন থেকে তাঁকেই বহন করতে হবে। শ্বেতাঙ্গ সরকার অভিযাত্রীদের জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দিলেও তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে অসম্মত। সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন —অভিযাত্রীরা জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশ করার ফলে যদি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেজন্য অভিযাত্রীরাই দায়ী হবেন—স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট জুলুদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবেন না; অবশ্য বিদ্রোহ কিংবা গণহত্যা সংঘটিত হলে আলাদা কথা।

ওসব কথা শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নন আন্তিলিও। তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারতেন; জুলুদের ভাষা তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, ঐ ভাষা বলতে বা বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হতো না। আন্তিলিও তাঁর জুলু-অনুচর জামানির কাছে যা শুনেছিলেন, তা থেকে জুলুদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, জাত্যভিমানে গর্বিত জুলুজাতি অতিশয় সাহসী ও সহজ-সরল— আধুনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি তাদের পছন্দ নয়, তারা অনুসরণ করে

পূর্বপুরুষের প্রচলিত রীতিনীতি। আফ্রিকার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জাতিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জুলুজাতি।

সব কিছু শুনে আন্তিলিওর মনে হয়েছিল জুলুল্যাণ্ডে তাঁদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না। নিশ্চিন্ত মনে দলবল নিয়ে তিনি একটা বৃত্তাকার পর্বত-চূড়ার দিকে অগ্রসর হলেন। উক্ত পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিল অনেকগুলো কুটির। সেই কুটিরগুলোই ছিল আন্তিলিওর লক্ষ্যস্থল। এখানে বাস করে জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো। শ্বেতাঙ্গ সরকার কখনও তার কথার উপর কথা বলেন না; স্থানীয় ব্যাপারে জিপোসো হচ্ছে জুলুরাজ্যের মুকুটহীন রাজা।

'ছাখো', প্রফেসর বললেন, 'সর্দারের নিশ্চয়ই চল্লিশটি বৌ আছে।'

ঠিকই বলেছিলেন প্রফেসর। তবে সদার-পত্নীদের সঠিক সংখ্যা অনুমান করার জন্য প্রফেসরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করলে ভুল হবে— জুলুজাতির সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যারা অবহিত, তাদের পক্ষে যে কোনও জুলু-পুরুষের আস্তানার সম্মুখীন হয়ে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা বলে দেওয়া খুবই সহজ। জুলুরা গ্রামবাসী নয়; প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তার বৌদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস করে— সবচেয়ে বড় কুটিরটাতে বাস করে কর্তা স্বয়ং, এবং গরু রাখার জন্য যে বিস্তীর্ণ স্থানটিকে বেড়ার সাহায্যে ঘিরে ফেলা হয়, সেই ঘেরা-জায়গার চারপাশে মালিকের স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে একটি করে কুটির। পূর্বোক্ত পত্নীরা তাদের নিজস্ব সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঐ সব কুটিরে বাস করে। অতএব বৃহত্তম কুটিরটির আশে-পাশে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কুটিরগুলোর সংখ্যা দেখে অনায়াসেই আস্তানার মালিকের স্ত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। বহু কুটির নিয়ে গঠিত জুলুদের এই আস্তানাকে বলে 'ক্রাল'। একটি ক্রাল থেকে আর একটি ক্রালের দূরত্ব খুব কম নয়। বেশ কয়েক মাইল দূরে দূরে অবস্থিত ক্রাল প্রায়ই দেখা যায় জুলুদের দেশে।

প্রফেসর বললেন, 'ছাখো, ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

হ্যাঁ, ওরা অপেক্ষা করছিল। পুরুষদের নিয়ে গঠিত এক বৃহৎ জুলু জনতা নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের চার পাশে দণ্ডায়মান জুলু মেয়েরা কলকণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ করলেও পুরুষরা ছিল প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল, নীরব।

জিপোসোর নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগ যে অতিশয় সক্রিয়, এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। কারণ জিপোসোর আস্তানা বা ক্রালের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অভিযাত্রীরা কোনও মানুষকে দেখতে পান নি, অথবা ঢাকের আওয়াজও তাঁদের শ্রুতিগোচর হয় নি—অথচ যথাস্থানে পৌঁছেই তাঁরা দেখলেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিপুল জনতা! জুলুরা কিভাবে বাস করে সে কথা আগেই বলেছি, কাজেই দূর-দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন ক্রাল থেকে যে ঐসব মানুষকে যথাসময়ে ডেকে আনা হয়েছে, একথা অনুমান করা কঠিন নয়।

ভিড়ের মধ্যে জুলুদের অধিনায়ক জিপোসো দাঁড়িয়ে ছিল জনতার ঠিক মাঝখানে। তার অঙ্গ বেষ্টন করে ঝুলছিল একটা লেপার্ডের চামড়া। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য জানোয়ারের লেজ ঐ লেপার্ড চর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জুলুসর্দারের অঙ্গের শোভা বর্ধন করছিল। তার কেশশূন্য মস্তকে উষ্ণীষের অভাব পূরণ করেছিল অনেকগুলো রঙ্গিন পাখির পালক। বহু বর্ণে রঞ্জিত ঐ পালকগুলো বাতাসের ধাক্কায় দুলছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রখর সূর্যালোকে জ্বলে জ্বলে উঠছিল দোদুল্যমান রামধনুর রঙিন সমারোহ!

জিপোসোর গায়ের রং কালো নয়,—হালকা-বাদামী। সেই বাদামী দেহের অপূর্ব ভঙ্গী, উন্নত মস্তক ও কালো কালো দুই চোখের তীব্র উদ্ধত চাহনি যেন নীরব ভাষায় এক প্রচণ্ড পুরুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে—প্রথম দর্শনেই মনে হয়—হ্যাঁ, একটা পুরুষের মতো পুরুষ বটে সর্দার জিপোসো!

'সালাগাত্‌লে', আত্তিলিও বললেন, 'তুমি শান্তিতে থাকো।'

'স্যাগাবোনা, জা বাব', স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল হল জুলুসর্দারের

মুখমণ্ডল, 'ফদার, তুমি শান্তিপ্রিয় মানুষ।'

জামানি হাঁটু পেতে বসে সর্দারের সামনে ভূমিতে ললাট স্পর্শ করল। জিপাসো একবার তার দিকে তাকিয়ে জামানির অভিবাদন গ্রহণ করল, তারপর আত্তিলিওর দিকে ফিরল, 'আমি শুনেছি তুমি ওর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছ।'

মুহূর্তের মধ্যেই আত্তিলিও অনুভব করলেন প্রবল প্রতাপশালী এই জুলুসর্দারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। জনতার প্রবল হর্ষধ্বনি থেকে বোঝা গেল, জুলুরাও অভিযাত্রীদের পছন্দ করেছে। আত্তিলিওর অনুচর জামানি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল। যোদ্ধাদের হাতে বর্শাগুলো আনন্দের আবেগে শূন্যে তুলে উঠল বারংবার, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নারীকণ্ঠে জাগল তীব্র উল্লাসধ্বনি!'

তারপর সর্দার জিপোসোর আদেশে মহামান্য অতিথিদের জন্য এল মেহগনি কাঠের আসন, খাদ্য-পানীয়। সকলে মিলে একসঙ্গে পানভোজন করতে করতে গল্পগুজব আরম্ভ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: প্রফেসরের কীর্তি

জামানি কাজের লোক। অভিযাত্রীরা যেদিন জুলুদের দেশে পদার্পণ করলেন, সেইদিনই রাতের দিকে তাঁদের বসবাসের উপযুক্ত একটা সুন্দর উপত্যকা আবিষ্কার করে ফেলল জামানি। এক সপ্তাহ লাগল সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করতে, ইতিমধ্যে কুলির সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থাও হয়েছিল—তারপর স্থায়ীভাবে একটা তাঁবু খাটিয়ে বেশ কিছুদিন জুলুদের দেশে থাকার বন্দোবস্ত করলেন অভিযাত্রীরা।

স্থায়ী আস্তানা পেতে ফেলার পরই ম্যাজিক, যাদু-বিদ্যা, ডাকিনী-তন্ত্র প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে অভিযাত্রীদের পরিচয় হতে লাগল প্রতিদিন। জুলুরা অলৌকিক কার্যকলাপে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা প্রতিদিনের ছোটখাট ব্যাপার থেকে শুরু করে যাবতীয়

আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্ম দায়ী পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার দল। প্রেতাত্মার রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ম তারা বিভিন্ন যাদুকরের সাহায্যপ্রার্থী হয়। জুলুদের উপর তাই যাদুকরদের প্রভাব খুব বেশী।

আম্ভিলিও এবং তাঁর দুই বন্ধু আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা করতে এসেছিলেন, তাই জুলুজাতির গড়পড়তা দৈহিক পরিমাপ নেওয়া তাঁদের দরকার ছিল। মাপ দেওয়ার আগে প্রত্যেক জুলু তার পছন্দসই যাদুকরের কাছ থেকে কবচ বা তাবিজ সংগ্রহ করেছিল—ঐ কবচ নাকি তাদের সাদা মানুষের ম্যাজিক থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু মাপ নেওয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অভিযাত্রীদের কাছ থেকে তামার তার, 'টম্বাকো' (তামাক), দেশলাই, ছোরা প্রভৃতি উপহার পেয়ে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। জিনিসগুলো তাদের যে সত্যি সত্যি দিয়ে দেওয়া হল, সেকথা তারা প্রথমে বুঝতে পারল না—এমন মূল্যবান সব উপহার কেন তাদের দেওয়া হচ্ছে ? তারা তো সাদা মানুষদের জন্ম কিছুই করে নি ! তবে ?……অবশেষে যখন তারা বুঝল ঐসব জিনিস তাদের উপহার দেওয়া হয়েছে এবং এগুলো আর ফেরত নেওয়া হবে না, তখন তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথম বিস্ময়ের চমক কেটে যেতেই জাগল অনেকের প্রবল উচ্ছ্বাস। উত্তেজিত ও আনন্দিত জুলুদের সশব্দ হাস্যধ্বনি শুনে অভিযাত্রীরাও খুশী।

কিন্তু অভিযাত্রীরা যখন 'প্লাস্টার অব প্যারিস' দিয়ে মুখের ছাপ নেবার চেষ্টা করলেন, তখন তাঁরা দেখলেন এই ব্যাপারটা আগের মতো সহজে হওয়ার নয়। প্যারিস প্লাস্টারের ছাপ তোলার হাঙ্গামা যথেষ্ট। ঘন আঠার মতো অর্ধতরল জিনিসটা যখন ব্যক্তিবিশেষের মুখের উপর মাখানো হয়, তখন সেই লোকটির নাকের দুই ফুটো দিয়ে দুটি খড় চালিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়, এবং পূর্বোক্ত তরল প্লাস্টার শুকিয়ে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ লোকটির

একটুও নড়াচড়া করার উপায় থাকে না। মুখের গোঁফ দাড়ি প্রভৃতি ছাপ তোলার আগে তেল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু তেলের পরিমাণ কম হলে প্লাস্টারের ছাঁচ বা মুখোস টেনে নেওয়ার সময় মুখের গোঁফদাড়ি ছিঁড়ে মুখের ছাপের সঙ্গে উঠে আসে! ব্যাপারটা মোটেই আরামদায়ক নয়!

তবে এইসব অসুবিধা সহ্য করতে জুলুদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তাদের আপত্তির কারণ অন্য। জুলুদের সামনেই অভিযাত্রীরা জামানির মুখের ছাপ নিলেন। জুলুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল, কিন্তু একজন মুখের ছাপ দিতে রাজী হল না। তাদের ব্যক্তব্য হচ্ছে ঐ ছাপ তুলতে দিলে তাদের 'দ্বিতীয় মুখ' সাদা মানুষদের সঙ্গে থেকে যাবে এবং কোনও শত্রু যদি উক্ত 'দুই নম্বর মুখে' আঘাত করে, তবে মুখের প্রকৃত অধিকারীর উপর সেই আঘাত এসে পড়বে। অতএব বহু মূল্যবান উপহারের বিনিময়েও তারা মুখের ছাপ তুলতে দিতে রাজী নয়।

কয়েকজন যাদুকর গম্ভীরভাবে জানাল, যাদুবিদ্যার সাহায্যে এমন অভিনব দুর্ঘটনা থেকে জুলুদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই। ব্যস! হয়ে গেল! যাদুকর যেখানে ভয় পায়, সেখানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আছে কার?……ইতিপূর্বেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা সংস্কার-অন্ধ মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছে, মনে হল আত্তিলিওর দলও কুসংস্কারের কাছে পরাজিত হবে। কিন্তু অভিযাত্রীরা জানতেন কুসংস্কারকে পরাস্ত করতে হলে তার বিরুদ্ধে অন্ধ-সংস্কারকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয়—অবশ্য যদি সেরকম সুযোগ পাওয়া যায়।

সুযোগ এল অপ্রত্যাশিতভাবে।

বহু দূরবর্তী এক ক্রাল থেকে জনৈক জুলুযোদ্ধা অভিযাত্রীদের তাঁবু পরিদর্শন করতে এল। তার বাঁ দিকের গাল খুব ফুলেছে দেখে আত্তিলিও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল বেচারা দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, খারাপ দাঁতের জন্যই তার গণ্ডদেশের

ঐ দুরবস্থা। সিগারেট উপহার দিয়ে আন্তিলিও তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন, তারপর দাঁতের চিকিৎসা করার জন্য এগিয়ে এলেন প্রফেসর।

লোকটিকে হাঁ করতে বলে প্রফেসর তার মুখের ভিতর একটা ক্ষতযুক্ত গর্ত দেখতে পেলেন। লবঙ্গ দিয়ে তৈরী একরকম চটপটে আঠার মতো ঘন পদার্থ দিয়ে ক্ষতটাকে ঢেকে দিলেন প্রফেসর। ঐ অদ্ভুত চটচটে পদার্থটি প্রফেসরের নিজস্ব আবিষ্কার। যাতনাদায়ক দাঁতের রোগে ঐ বস্তু ছিল অব্যর্থ ঔষধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চটচটে জিনিসটা জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়, আর তৎক্ষণাৎ দাঁত ব্যথার উপশম হয় মন্ত্রের মতো। লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দুজনে মিলে তাকে ক্যানভাসের উপর শুইয়ে ফেলে মুখে প্যারিস প্লাস্টারের প্রলেপ লাগাতে শুরু করলেন। হঠাৎ দাঁতের যন্ত্রণা কমে যাওয়ায় লোকটাও অবাক হয়ে গিয়েছিল, বাদ-প্রতিবাদ না করে সে প্রফেসর আর আন্তিলিওর হাতে আত্মসমর্পণ করল। কিছুক্ষণ পরে কাজ শেষ হয়ে যেতেই অভিযাত্রীরা তার মুখের উপর থেকে শক্ত প্লাস্টারের ছাপ, অর্থাৎ লোকটার মুখের ছাপ তুলে ফেললেন।

জুলুযোদ্ধা হতভম্ব হয়ে একবার গালের উপর হাত বুলিয়ে নিল, একবার হাঁ করল, তারপর আবার মুখটা বন্ধ করল। তার ভয়ানক দাঁতের ব্যথা এমন চটপট সেরে যাওয়ায় সে যে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অভিযাত্রীরা তাকে কিছু উপহার দেবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রফেসরের হাতে একটা আসাগাই (বর্শা) গুঁজে দিল।—ডাক্তারের 'ফী'।

পরক্ষণেই দেখা গেল দারুণ আনন্দে চিৎকার করতে করতে জুলুযোদ্ধা তীরবেগে ছুটছে। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে এমন আকস্মিক-ভাবে মুক্তি পেয়ে তার উল্লাস যেন ফেটে পড়তে চাইছে······

পরের দিন অভিযাত্রীরা দেখলেন 'দ্বিতীয় মুখ' সম্বন্ধে জুলুদের

ভয় ভেঙে গেছে একদিনের মধ্যেই। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে সর্বসমেত উনিশটি জুলু এসে অভিযাত্রীদের জানাল, দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুখের ছাপ তুলে চিকিৎসা করাতে তাদের আপত্তি নেই। আরোগ্যলাভ করতে পারলেই তারা খুশী 'দ্বিতীয় মুখ' নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না!·· ···

চিকিৎসার ফল হল অতীব সন্তোষজনক। জুলুরা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, হাতে তৈরী সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিস ও আসন অভিযাত্রীদের উপহার দিল। ইতিপূর্বে ঐ সব জিনিস দাম দিয়েও কিনতে পারেন নি অভিযাত্রীরা—বিনীতভাবে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে অসম্মতি জানিয়েছিল জুলুরা। এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই ঐ সব বস্তু উপহার দিয়ে রোগমুক্ত জুলুরা অভিযাত্রীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। অভিযাত্রীরা যে শুধু নানারকম ভালো ভালো উপহারই পেয়েছিলেন তা নয়, শতাধিক স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। এই জন্য অবশ্য প্রফেসরকেই ধন্যবাদ দিতে হয়—তাঁর দাঁতের রোগের অব্যর্থ দাওয়াই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সন্ত্রাস ও বিভীষিকা

জুলুদের দেশে বৃষ্টিপাত একটা গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। বৃষ্টিপাতের ফলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলো হয়ে ওঠে সবুজ ঘাসের রাজত্ব; এবং ঐ ঘাসজমি থেকে আহার্য সংগ্রহ করে জুলুদের গৃহপালিত গরুর পাল মনের আনন্দে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। গরু হচ্ছে জুলুদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। গরুর বিনিময়ে তারা পত্নী সংগ্রহ করতে পারে, তাছাড়া গোমাংস ও গোদুগ্ধ তাদের উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করাতেও সাহায্য করে।

বর্ষার জল যে শুধু জুলুদের গো-সম্পদ বৃদ্ধি করে তা নয়, অবিশ্রান্ত ধারাপাত দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। বৃষ্টিপাতের ফলে

শ্যাম-সবুজ অরণ্যের বুক থেকে আহার্য সংগ্রহ করে তৃণভোজী জেব্রা, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি জন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং ঐ সব পশুর মাংসে জীবনধারণ করে জুলুল্যাণ্ডের অগণিত সিংহের দল। কিন্তু বৃষ্টি না হলে বন্য পশুরা শুধু বনভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, আর ক্ষুধার্ত সিংহরা আকৃষ্ট হয় গোমাংস ও নরমাংসের প্রতি—ফলে জুলু-ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধ্বংস করে শুরু হয় ভয়াবহ বিভীষিকার রক্তাক্ত তাণ্ডব।

অনাবৃষ্টি যে জুলুদের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, কতখানি প্রাণঘাতী সর্বনাশ যে ডেকে আনতে পারে বৃষ্টিবিহীন খরার জ্বলন্ত অভিশাপ—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলেন অভিযাত্রীরা···

আত্তিলিও এবং তাঁর দলবল জুলুল্যাণ্ডে পদার্পণ করার কয়েকমাস পরেই সেখানে অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হয়। শুধু বনভূমি থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে না পেরে বহু তৃণভোজী পশু মৃত্যুবরণ করল। যারা বাঁচল তারা অন্যত্র যাত্রা করল তৃণশ্যামল অরণ্যের সন্ধানে। দক্ষিণ দিকের পথে ছুটল ইম্পালা, অরিক্স, ইল্যাণ্ড, ন্যু, জেব্রা, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি তৃণভোজী পশু। ধাবমান পশুদের খুরে খুরে ধুলো উড়ে দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে দিল। পাহাড়ের চূড়ার উপর বিভিন্ন আস্তানা থেকে জুলুরা সেই ধুলোর মেঘ লক্ষ্য করতে লাগল উদ্বিগ্ন চিত্তে। অনাবৃষ্টির দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি সময়ে অদৃশ্য হল সেই ধুলোর মেঘ। সেই সঙ্গে অন্তর্ধান করল তৃণভোজী পশুর দল। বলিষ্ঠ সিংহের দলও তৃণভোজীদের সঙ্গে স্থান ত্যাগ করেছিল, কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক জন্তুগুলো থেকে গেল জুলুল্যাণ্ডের শুষ্ক অরণ্যে—অপ্রাপ্তবয়স্ক একদল তরুণ সিংহ, অভিজ্ঞতার অভাবে যারা বেপরোয়া; বৃদ্ধ সিংহ, দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে যারা অশক্ত, কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারীর কৌশল ও চাতুর্যে যারা ভয়ংকর; এবং শাবকসমেত সিংহীর দল, যারা বাচ্চার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

ক্ষুধার্ত সিংহরা এইবার জুলুদের গরুর দিকে নজর দিল।

বর্শাধারী জুলুযোদ্ধার দল সতর্কভাবে তাদের গরু রক্ষা করতে সচেষ্ট হল। সিংহরা তখন মানুষের উপর হামলা শুরু করল। কয়েকবার নর-মাংসের স্বাদ গ্রহণ করে জন্তুগুলো ক্ষেপে গেল। দলবদ্ধ নেকড়ের মতোই তারা মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, কুটিরেরর দরজা বন্ধ করেও কেউ আর নিরাপদ বোধ করে না—দরজা ভেঙ্গে নরখাদক সিংহের দল মানুষ ধরতে আরম্ভ করল। সিংহের এমন অদ্ভুত ও ভয়ংকর আচরণ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

এককভাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। জুলুবা দল বেঁধে অস্ত্র হাতে ভ্রমণ করতো। কাঁটাগাছের বেড়া নিয়ে জুলুল্যাণ্ডের ক্রাল-গুলোকে ঘিরে ফেলা হল। ঐ সব ক্রালের চারপাশে সারারাত আগুন জ্বলতো। দৈবাৎ আগুন নিভে গেলেই হানা দেবে নরভুক্ শ্বাপদ। তাই শয্যা আশ্রয় করার আগে প্রত্যেক জুলু কুটিরের বহির্ভাগে অবস্থিত অগ্নিকুণ্ডে সারারাত জ্বলবার মতো কাঠ আছে কিনা দেখে নিতো, ঐ সঙ্গে কাঁটার বেড়ার মধ্যেও ফাঁক আছে কি নেই দেখতে তাদের ভুল হতো না।

এত সতর্ক হাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ঢাকের আওয়াজে দুর্ঘটনার সংবাদ ভেসে আসতে লাগল। দিনে-রাতে যেখানে-সেখানে, যখন-তখন সিংহরা আক্রমণ চালাতে শুরু করল। নিরস্ত্র বালিকা থেকে শুরু করে দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী যোদ্ধা পর্যন্ত কোন মানুষকেই রেয়াৎ করতো না হিংস্র শ্বাপদ। দলবদ্ধ সিংহের সঙ্গে বর্শা হাতেই লড়াই করে প্রাণ দিল বহু জুলুযোদ্ধা। তাঁদের সাহসও বীরত্বের তুলনা হয় না, কিন্তু ক্ষিপ্ত সিংহদের নিরস্ত করা গেল না কিছুতেই—সমগ্র জুলুল্যাণ্ডের উপর মাংসলোলুপ শ্বাপদের নখদন্তে সৃষ্ট হল সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব!

অভিযাত্রীদের কাজকর্মও ব্যহত হল। জুলুদের পক্ষে দূর-দূরান্তের ক্রাল থেকে এখন আর অভিযাত্রীদের তাঁবুতে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিযাত্রীরা জুলুদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। প্রফেসর

বিলকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সিংহের কবল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় হতভাগ্যের চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। অনেকে তাঁর চিকিৎসার গুণে বেঁচে গিয়েছিল।

আত্তিলিও গত্তি চিকিৎসার বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। কিন্তু কিন্তু তিনিও জুলুদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হলেন। তবে ঔষধপত্র বা শল্যচিকিৎসকের ছুরির পরিবর্তে তাঁর হাতে ছিল গুলিভরা রাইফেল। বিলকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন প্রফেসর তাঁর চিকিৎসা কার্যে সাহায্য করার জন্য, সুতরাং সম্পূর্ণ এককভাবেই সিংহ-নিধনে নিযুক্ত হলেন আত্তিলিও। খরার তৃতীয় মাসের মধ্যেই তাঁর রাইফেলের অগ্নিবর্ষী মহিমায় স্তব্ধ হয়ে গেল তিরিশটা সিংহের গর্জিত কণ্ঠ।

কিন্তু তারপরই বিপদ এল অতর্কিতে।

এক শয়তানের চক্রান্তে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আত্তিলিও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দুয়ারে মৃত্যুর ছায়া

টোয়াবেনি ছিল জুলুল্যাণ্ডের আতঙ্ক। কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতো না। সে নিজেও লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার আগ্রহ প্রকাশ করতো না। অভিযাত্রীরা অনেকবার জামানিকে পাঠিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে তাঁদের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু টোয়াবেনি সাড়া দেয়নি। দুর্দান্ত প্রতাপশালী জিপোসো সর্দার পর্যন্ত টোয়াবেনিকে এড়িয়ে চলতো। আত্তিলিও যখন নিজেই এগিয়ে গিয়ে টোয়াবেনির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তখন তাঁর সঙ্গী হল জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো স্বয়ং। স্পষ্টই বোঝা যায় টোয়াবেনির আস্তানার মধ্যে আত্তিলিওর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে পারে বলেই জিপোসো তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

আত্তিলিও একটা কম্বল নিয়ে গিয়েছিলেন টোয়াবেনিকে উপহার দেবার জন্য। টোয়াবেনি একবার আত্তিলিওর দিকে দৃষ্টিপাত করল,

পরক্ষণেই কম্বলটা টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে সে সবচেয়ে বড় কুঁড়ে ঘরটার ভিতর ঢুকে গেল। একটু পরেই অবশ্য কুটিরের বাইরে এসে আত্তিলিওকে উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল টোয়াবেনি। সেইসঙ্গে ভদ্রতা করে একথাও জানালে যে, তার ক্রাল সর্বদাই আত্তিলিওকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত। ইচ্ছে হলেই তিনি যেন তার আস্তানায় চলে আসেন।

টোয়াবেনির ব্যবহার ছিল বেশ স্বাভাবিক ও ভদ্র, কিন্তু আত্তিলির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে ঐ লোকদের সম্বন্ধে বার বার সাবধান করে দিল—অন্তরের অন্তস্থলে তিনি অনুভব করলেন টোয়াবেনি তাঁকে পছন্দ করছে না, সুযোগ পেলেই সে শত্রুতা করবে। অবশ্য প্রথম সাক্ষাৎকারের পর বেশ কয়েকবার আত্তিলিও তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তবে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটেনি। দুটি মানুষের মধ্যে বার বার দেখা সাক্ষাৎ ঘটলে সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠতা হয়, কিন্তু নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে টোয়াবেনি নিজেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র করে রেখেছে, মন খুলে কখনও সে কথা বলেনি আত্তিলিওর সঙ্গে।

চোদ্দটি স্ত্রী-র স্বামী এবং তিরিশটি কন্যার পিতা ছিল টেয়াবিনি। তার পরিবারবর্গের মধ্যে কারও সঙ্গেই আত্তিলিওর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কিন্তু টোয়াবেনির ষোল বছরের মেয়ে ম্‌দাবলি আত্তিলিওর প্রতি আকৃষ্ট হল। খুব সম্ভব বনবালা ম্‌দাবুলি তার সহজাত সংস্কার দিয়ে আত্তিলিওর মধ্যে এক সহানুভূতি সম্পন্ন বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল। মেয়েটির জীবনে যে একটি সত্যিকার বন্ধুর দরকার হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনাস্রোত থেকে আমরা শীঘ্রই তা জানতে পারব।

একদিন মধ্যাহ্নে জ্বলন্ত আফ্রিকার সূর্য যখন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে সেইসময় রাইফেল হাতে আত্তিলিও এলেন টোয়াবেনির ক্রালে। সিংহের আক্রমণ থেকে তার ক্রালকে নিরাপদ রাখার জন্য টেয়াবেনি কি ব্যবস্থা করেছে সেইটা দেখাই ছিল আত্তিলিওর উদ্দেশ্য। টোয়াবেনির আস্তানার সামনে গিয়ে আত্তিলিও অবাক

হয়ে গেলেন—ক্রালটাকে বেষ্টন করে বিরাজ করছে কণ্টকসজ্জিত গাছপালার এক বিরাট দুর্ভেদ্য ব্যূহ, এবং ব্যূহের চারপাশ ঘিরে সারারাত ধরে জ্বলবার জন্য সংগৃহীত হয়েছে রাশি রাশি শুকনো কাঠ—একবার তাকিয়েই বোঝা যায় শতাধিক লোকের সাহায্য ছাড়া এমন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আত্তিলিও আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন দিনদুপুরে লোকজন, গরুবাছুর এমনভাবে বেড়ার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কেন? সিংহগুলো কি এখানে প্রখর দিবালোকের মধ্যেই হানা দিতে শুরু করেছে?…পানীয় জল আনতে আর গরুবাছুর চরাতে মানুষজন নিশ্চয়ই বেড়ার বাইরে যাতায়াত করে—কিন্তু কোন্ পথে? কণ্টক-শোভিত ব্যূহের কোথাও তো এতটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে না!……

একটা পথের রেখা পাওয়া গেল। আত্তিলিওর মনে হল ঐ পথেই লোক চলাচল করে। সন্দিগ্ধ চিত্তে সেই পথ ধরে বেড়ার দিকে অগ্রসর হলেন আত্তিলিও, আর হঠাৎ তাঁর সামনে প্রায় দশ ফিট জায়গা নিয়ে বেড়ার একটা বিস্তীর্ণ অংশ কাঁপতে শুরু করল! তারপর নিঃশব্দে ঐ জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল এবং বিভক্ত বেড়ার ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করল স্বয়ং টৈয়াবেনি!

'জা বাব, ভিতরে এস' টোয়াবেনি বলল, 'তাড়াতাড়ি করো। চারপাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সিংহরা। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওরা আমাদের লক্ষ্য করছে।'

আত্তিলিও ভিতরে প্রবেশ করলেন। এমন চমৎকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং বিস্ময়কর দ্বারপথের আবিষ্কার করার জন্য টোয়াবেনির বুদ্ধির তারিফ করলেন আত্তিলিও।

প্রশংসা শুনে খুশী হল টোয়াবেনি। এতদিনের মধ্যে সেদিনই শুধু তার কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের আভাস পাওয়া গেল—'দ্যাখো, কত সহজে কোনও শব্দ না করে এটা খোলা যায় আর বন্ধ করা যায়।'

আত্তিলিও দেখলেন দুটি দড়ির সাহায্যে টোয়াবেনি তার নিরাপদ আশ্রয়ের ভিতর থেকেই কুটিরের ভিতর অবস্থিত দরজাটাকে

ইচ্ছানুযায়ী খুলতে পারে বা বন্ধ করতে পারে। প্রতিরোধের এমন কৌশল যার মগজ থেকে উৎপন্ন হয়, সেই মগজের অধিকারী যে অতিশয় বুদ্ধিমান সে বিষয়ে সন্দেহ সেই। টোয়াবেনি জানাল একটু আগেই দরজাটা আর একবার ব্যবহার করার দরকার হয়েছিল। আত্তিলিও ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনতে চাইলেন।

'আমার গরুর দল মাঠে ঘাস খাচ্ছিল, হঠাৎ সিংহ তাদের আক্রমণ করল ' টোয়াবেনি বলতে লাগল 'আমি ঘরের ভিতর থেকে দড়ি টেনে দরজা খুলে দিতেই আমার ছেলেরা গরুগুলোকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দুটো বাছুর এর মধ্যেই সিংহের আক্রমণে মারা পড়েছিল। সিংহরা যখন বাছুর দুটির মাংস খেতে ব্যস্ত, সেই সময়টুকুর সুযোগ নিয়েই আমার ছেলেরা ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল— আর তারা ভিতরে আসা মাত্রই আমি আবার দড়ি টেনে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঠিক সময়মতোই দরজাটা আমি বন্ধ করেছিলাম; কারণ, খিদের প্রথম ঝোঁক কেটে গেলেই সিংহগুলো ভিতরে আসার চেষ্টা করতো। ঐ পাহাড়টার ওপারে আমার ভাই-এর আস্তানায় ছেলেরা এখন চলে গেছে। ভাই-এর ক্রালটকে ঘিরে এইরকম একটা বেড়া দেওয়া দরকার,—তাকে সাহায্য করার জন্যই রওনা হয়েছে আমার ছেলেরা।'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গেল টোয়াবেনি। তার মুখের উপর ফুটে উঠল নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচিত ভঙ্গী— আর একটি কথাও না বলে সে হঠাৎ পিছন ফিরে অদৃশ্য হল তার নিজস্ব কুটিরের ভিতর।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত কুটিরের ভিতর থেকে একটা মুখ বাইরে উঁকি দিল!

ম্‌দাবুলি!

আত্তিলিও দেখলেন জুলু বালিকার মুখে আজ আনন্দের চিহ্ন নেই। বিষণ্ণভাবে সে আত্তিলিওকে তার কুটিরের ভিতর আসতে ইঙ্গিত করল।

আভিলিও ভিতরে ঢুকলেন। ম্দাবুলি জানাল তার মা গেছে সপত্নীদের সঙ্গে গল্প করতে অন্য কুটিরে। মায়ের অনুপস্থিতিতে শিষ্টাচারের ত্রুটি হতে দেয়নি মেয়ে—বসবার জন্য অতিথিকে একটা কাঠের আসন এনে দিল ম্দাবুলি।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর আভিলিও জানালেন ম্দাবুলির মুখে বিষাদের মেঘ তাঁর ভালো লাগে না, তিনি তার হাসিমুখ দেখতে চান।

ম্দাবুলির মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু শুধু এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই ছ'হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল। তারপরই মেঝের উপর শুয়ে পড়ে সে ফোঁপাতে লাগল। কান্নার আবেগে তার দেহটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

আভিলিও হয়ে গেলেন হতভম্ব। টোয়াবেনি যদি এই কান্নার শব্দ শোনে তাহলে সে কি মনে করবে?......কথাটা চিন্তা করতেই আভিলিওর খারাপ লাগল। তিনি মনে মনে কামনা করলেন এই মুহূর্তে যেন কেউ এসে পড়ে, তাহলে এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি থেকে তিনিও পরিত্রাণ পেতে পারেন। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গেই দ্রুত ধাবমান পদশব্দ তাঁর কানে এল। কিন্তু না—কেউ এল না। খুব সম্ভব, আভিলিও ভুল শুনেছেন। একটা মোরগ ক্রুদ্ধস্বরে ডেকে উঠল, গোয়ালের বেষ্টনী থেকে ভেসে এল গোবৎসের করুণ কণ্ঠধ্বনি—তারপর আবার সব চুপচাপ।—কান্নার প্রথম আবেগ সামলে নিল ম্দাবুলি, ছ'একবার ফুঁপিয়ে সে আত্মসংবরণ করল। অবশেষে মর্মযাতনার তীব্র উচ্ছ্বাস কেটে গেল, শান্ত সংযত স্বরে কথা বলতে পারল জুলু বালিকা, 'টোয়াবেনি ওকে খুন করবে—কিংবা আমাকে।'

'আমাকে' অর্থাৎ ম্দাবুলিকে খুন করা টোয়াবেনির মতো বাপের পক্ষে খুব অসম্ভব নয়, কিন্তু আভিলিওর জিজ্ঞাস্য হল এই 'ও' কে?

ধীরে ধীরে সব কিছুই জানতে পারলেন আভিলিও। 'ও' হচ্ছে এক তরুণ জুলুযোদ্ধা, নাম তার ন্গো। উক্ত জুলু যুবকের সঙ্গে

আত্তিলিও ভালো ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ম্‌দাবুলি অসঙ্কোচে জানাল সে আর ন্‌গো পরস্পরকে বিবাহ করতে চায়। টোয়াবেনিকে তিরিশটা গরু কন্যাপণ হিসাবে দিতো চেয়েছিল ন্‌গো, কিন্তু টোয়াবেনি তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হয় নি।

এতগুলো গরুর বিনময়েও টোয়াবেনি কন্যাদান করতে রাজী হয়নি শুনে অবাক হয়ে গেলেন আত্তিলিও। ন্‌গোকে তিনি খুব ভালো করেই জানেন, পাত্র হিসাবে সে চমৎকার ছেলে—তবে টোয়াবেনির রাজী না হওয়ার কারণ কি ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বালিকা জানাল টোয়াবেনি একসময়ে [illegible] যাদুকর ছিল। টোয়াবেনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করে সর্দার জিপোসো এবং 'ইনডানাদের' সভা (জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভা) অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে যাদুকরের সম্মানিত পদ থেকে খারিজ করে দেয়। এই ঘটনা ঘটেছিল কয়েক বছর আগে। অভিযোগ যে এনেছিল সে হচ্ছে জুলুদের এক ছোটখাট নেতা, ন্‌গো তারই পুত্র। কিছুদিন আগে অভিযোগকারী— অর্থাৎ, ন্‌গোর পিতা—সিংহের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। শত্রু সিংহের কবলে মারা গেছে বটে কিন্তু টোয়াবেনির বিদ্বেষ আজও জাগ্রত— যার অভিযোগের ফলে টোয়াবেনি পদমর্যাদা হারিয়েছে, তার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না।

টোয়াবেনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বক্তব্য কি ছিল, অথবা কোন্ ধরনের যাদুকর ছিল টোয়াবেনি--এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বার বার আত্তিলিওকে এক কথা বলতে লাগল, 'বাবা বলছে ন্‌গোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্মতি দেবার আগে সে মেয়ের আর ন্‌গোর মরা মুখ দেখবে।'

আত্তিলিও জুলুদের নিয়ম-কানুন যেটুকু জানতেন, তা থেকে বুঝলেন এই বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

'জা বাব' ম্‌দাবুলি বলল, 'আমি তোমার সাহায্য চাই।'

তা তো বুঝলুম,' আত্তিলিও মনে মনে বললেন, কিন্তু আমি

বিদেশী মানুষ, জুলুদের সামাজিক ব্যাপারে হাত দেব কি করে?'

তাঁর মৌনব্রত দেখে ম্‌দাবুলি নিরস্ত হল না। সে আত্তিলিওকে এই ব্যাপার নিয়ে টেয়াবেনির সঙ্গে কথা কইতে অনুরোধ করল। সে একথাও বলল আত্তিলিও যদি জিপোসোকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন, তাহলে হয়তো তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে—সর্বাধিনায়ক জিপোসো যদি চায় তাহলে টোয়াবেনির ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই বিবাহ হওয়া সম্ভব, জুলুল্যাণ্ডে জিপোসোর কথার উপর কথা বলার ক্ষমতা কারও নেই।

অশ্রুসজল চক্ষে বালিকা বার বার তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল, তার বিশ্বাস—আত্তিলিও যদি হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

এই মেয়েটিকে তিনি কি উপায়ে সাহায্য করতে পারেন সেই কথাই ভাবছিলেন আত্তিলিও, হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ম্‌দাবুলির সমস্ত শরীর হল আড়ষ্ট, মুখ হল রক্তহীন, বিবর্ণ ও বিকৃত!

আত্তিলিও চমকে উঠলেন, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে এল, 'নিশ্চয়ই ওকে অজান্তে বিষ খাওয়ানো হয়েছে?'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ম্‌দাবুলির পিছনে ছায়া-আচ্ছন্ন কুটিরের যে জায়গায় মধ্যাহ্নের সূর্যালোক প্রবেশ করেছিল, সেই আলোক-উজ্জ্বল স্থানে আবির্ভূত হল দ্রুত ধাবমান এক ছায়া!

আত্তিলিও বুঝলেন বিষ-টিষ কিছু নয়; অতিজাগ্রত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রখর অনুভূতি দিয়ে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়েছে বনমালা ম্‌দাবুলি—তাই এই ভাবান্তর!

বালিকার পিছনে, প্রায় ছ' ফিট দূরে কুটিরের প্রবেশ-পথে নড়ে উঠেছে সর্পিল ছায়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ বিপদ

সাপের মতো লম্বা দোদুল্যমান ছায়াটা যে একটি আন্দোলিত লাঙ্গুলের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা সহজেই বুঝলেন আন্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পিছনে অবস্থিত নিরেট কায়ার স্বরূপ নির্ণয় করতেও তার ভুল হল না—সমগ্র আফ্রিকাতে ঐভাবে চাবুকের মতো লেজ আছড়াতে পারে একটিমাত্র জীব—সিংহ !

ভয়াবহ পরিস্থিতি ! দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছে ক্ষুধিত শ্বাপদ ! যে কোন মূহূর্তেই সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে !

সতৃষ্ণ নয়নে রাইফেলটার দিকে তাকালেন আন্তিলিও। ছায়া দেখে বোঝা যায় সিংহ ওত পেতে বসে আছে দরজার বাইরে বাঁদিকে। ডানদিক দিয়ে ঘুরে রাইফেল হস্তগত করতে গেলে অস্ত্র তুলে নেবার আগেই সিংহ তাকে দেখতে পাবে এবং তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঁদিক দিয়ে ঘুরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাইফেলের নল ধরে সেটাকে টেনে আনা যায় বটে, কিন্তু ঐভাবে অস্ত্রটাকে বাগাতে হলে সিংহের খুব কাছাকাছি যেতে হয়।

আন্তিলিও শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করতে চাইলেন। তিনি বসেছিলেন, এইবার উঠে দাঁড়ালেন ; আস্তে-আস্তে, নিঃশব্দে।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন আন্তিলিও। কাঁটাগাছে ঘেরা অত উঁচু বেড়াটাকে যে জানোয়ার লাফ মেরে ডিঙ্গিয়ে আসতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বৃহৎ দেহের অধিকারী। দারুণ ক্ষুধার্ত না হলে সিংহ এরকম দুঃসাহসের পরিচয় দেয় না—আন্তিলিও বুঝলেন সিংহকে হত্যা করতে না পারলে আজ মৃত্যু তাঁর নিশ্চিত।

কিন্তু ঘরের মেঝেতে বিছানো মাদুরটাই গোলমাল বাধাল। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কট কট শব্দে প্রতিবাদ জানাতে লাগল মাদুর! আন্তিলিও মনে মনে মাদুরটাকে অভিশাপ দিলেন। কুটিরের ভিতর বদ্ধস্থানে ঐ কট কট শব্দটা তাঁর কানে পিস্তলের

আওয়াজের মতো আঘাত করছিল, অপেক্ষমান শ্বাপদ যে ঐ আওয়াজ থেকেই শত্রুর গতিবিধি বুঝতে পারছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য উপায় না থাকায় আত্তিলিও ঐভাবেই এগিয়ে চললেন। তিনি জানতেন, উজ্জ্বল দিবালোকের ভিতর দাঁড়িয়ে কুটিরের ম্লান অন্ধকারে জন্তুটা ভাল দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটু পরে অন্ধকারটা চোখে সহ্য হয়ে গেলেই সে ভিতরে ঢুকে পড়বে। ইতিমধ্যে যদি তিনি কিছু না করতে পারেন, তবে সিংহের কবলে তাঁর এবং ম্‌দাবুলির অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে সে কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলেন আত্তিলিও।

ম্‌দাবুলির সমস্ত শরীর তখন আড়ষ্ট। চোখে না দেখেও সে বুঝতে পেরেছে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে তার পিছনে। বালিকার ভীতি বিহ্বল দুই চক্ষু লক্ষ্য করছে আত্তিলিওর গতিবিধি এবং তার জিহ্বা হয়ে গেছে মৌন, নির্বাক। খুব ধীরে ধীরে তাকে পেরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন আত্তিলিও সাহেব।

প্রবেশ পথের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে সিংহ। তার দেহটা আত্তিলিওর চোখের আড়ালে, দৃশ্যমান শুধু তার ছায়া আর কর্ণগোচর হচ্ছে দেয়ালের ওধার থেকে ভেসে-আসা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গভীর জান্তব শব্দ।

চট করে থাবা চালিয়ে দিলেই এখন সিংহ আত্তিলিওকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু রাইফেলটা এসে গেছে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে—যা করতে হয় এখনই করতে হবে, সময় নেই—আত্তিলিও হাত বাড়ালেন।

তাঁর ঘর্মাক্ত হাতের মুঠি রাইফেলের ঠাণ্ডা নলটাকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল শ্বাপদ কণ্ঠের গর্জন ধ্বনি। রাইফেল উঠে এল হাতে। একটা সোনালী-বাদামী দেহ চমকে উঠল বিদ্যুৎ ঝলকের মতো—

প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন আত্তিলিও! পশুরাজও ভারসাম্য রাখতে পারল না, সংঘাতের ফলে সেও মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল।

সিংহ আবার উঠে আক্রমণ করার আগেই আত্তিলিও গড়াতে গড়াতে খোলা দরজা দিয়ে কুটিরের বাইরে চলে গেলেন। আকস্মিক বিপদে আত্তিলিওর বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি, গড়াগড়ি দেবার সময়ে চোখ ছুটো বন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি—অন্ধকার কুটিরের থেকে বাইরে তীব্র সূর্যালোকের মধ্যে এসে তাঁর চক্ষু ছুটি যে সাময়িক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে সেই ভয়াবহ তথ্য চরম মুহূর্তেও তিনি ভুলে যাননি, হাতের রাইফেলটাও তিনি হস্তচ্যুত হতে দেননি—অস্ত্রটাকে তিনি ধরে রেখেছিলেন শক্ত মুঠিতে।

আত্তিলিও যে-মুহূর্তে রোদের দিকে পিছন ফিরে রাইফেল তুলে কুটিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সিংহও ধরাশয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ল এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিতে উদ্যত হল—হাঁটু পেতে বসে রাইফেল উঁচিয়ে বললেন আত্তিলিও, 'শুয়ে পড়ো ম্‌দাবুলি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়ল ম্‌দাবুলি। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড সিংহনাদ। রাইফেলের কর্কশ ধমক। বারুদের উগ্র গন্ধের সঙ্গে মিশল শ্বাপদ-দেহের ছুর্গন্ধ—এবং রক্তের গন্ধ!

আবার জাগল শ্বাপদকণ্ঠে ভৈরব হুঙ্কার! রক্তাক্ত শরীরে গর্জে উঠল আহত সিংহ, মাথার উপর ছুলে ছুলে উঠল ঝাঁকড়া কেশর; তার জ্বলন্ত দৃষ্টি একবার পড়ছে ধরাশায়ী ম্‌দাবুলীর দিকে, আবার ঘুরে যাচ্ছে কুটিরের বাইরে উপবিষ্ট অস্ত্রধারী মানুষটার দিকে—সে এখনও ঠিক করতে পারছে না কার উপর প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। সিংহ মনস্থির করার আগেই আত্তিলিওর রাইফেল আবার অগ্নিবর্ষণ করল। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল সিংহের মাথার খুলি—সব শেষ! পশুরাজ আর কোনদিন নরমাংস খেতে চাইবে না।

…কিন্তু ম্‌দাবুলি? সে কথা কইছে না কেন? বালিকার দেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন আত্তিলিও। সিংহ তার দেহস্পর্শ করতে পারে নি। সে অজ্ঞানও হয়নি,—দারুণ আতঙ্ক সাময়িকভাবে তার

বাক্‌শক্তি ও চলৎশক্তিকে লুপ্ত করে দিয়েছে, কিন্তু তার চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত—দুই চোখের নীরব ভাষায় বালিকা আন্তিলিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

আর তারপরই যেন শুরু হল নরক-গুলজার! চতুর্দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বহু মানুষের পায়ের আওয়াজ; ভয়ার্ত গরু বাছুরের হাম্বাধ্বনি। টোয়াবেনি এসে উপস্থিত হল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। সেই সঙ্গে সেখানে এসে ভিড় করল বহু নারী ও বালক-বালিকা। পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে করতে তারা এগিয়ে এসে কুটিরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল, সিংহের মৃতদেহ নজরে আসামাত্র আবার পিছিয়ে গেল সভয়ে।

আন্তিলিও কুটিরের বাইরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যেই তিনি রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিয়েছেন এবং তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ম্‌দাবুলির বাপ টোয়াবেনি। টোয়াবেনির জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে আন্তিলিওর মনে হল—চোখ নয়, একজোড়া ধারালো ছুরির ফলা ঝকঝক করছে হত্যার আগ্রহে! তিক্ত কণ্ঠে আন্তিলিও প্রশ্ন করলেন, 'সিংহ ভিতরে এল কি করে?'

অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গীতে উত্তর এল, 'জানি না। আমি কুটিরের ভিতর ছিলাম। সিংহ কি করে এসেছে বলতে পারব না।'

টোয়াবেনি একটু থামল, তার পাতলা নাকের উপর ফুটে উঠল কুঞ্চন রেখার চিহ্ন, বলল 'গন্ধ পাচ্ছি, আমি ভয়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ: রহস্যময় ঢাক ও নিগ্রোদের অজ্ঞতা

'ভয়', টোয়াবেনি আবার বলল, 'আমি ভয়ের গন্ধ পাচ্ছি।' খুব অদ্ভুত কথা সন্দেহ নেই। ভয়ের আবার গন্ধ কি? কিন্তু শুধু যে কথাটাই অদ্ভুত তা নয়, টোয়াবেনির বলার ভঙ্গীও ছিল অদ্ভুত আর রহস্যময়।

আন্তিলিও বেড়ার গায়ে-লাগানো দরজার দিকে চাইলেন।

দরজাটা ঠিক ম্‌দাবুলির কুঁড়েঘরের দিকে—সব ঠিক আগের মতোই আছে···কিন্তু ঠিক আছে কি ?···না ! সব ঠিক নেই ! আত্তিলিও সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছে তাঁর জুতোপরা পায়ের ছাপগুলো ধুলোর উপর থেকে অদৃশ্য ! খুব তাড়াতাড়ি কেউ ঐ ছাপগুলো মুছে ফেলেছে !

কে ? কেন ? কোন্ উদ্দেশ্য ?

নীচু হয়ে ভাল করে জমি দেখতে লাগলেন আত্তিলিও—তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা পায়ের ছাপ উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেই সবুট পদচিহ্নকে প্রায় লুপ্ত করে তার উপর আত্মপ্রকাশ করেছে আর একটি গুরুভার জীবের সুগভীর পদচিহ্ন—সিংহের পায়ের দাগ !

ব্যাপারটা এইবার আত্তিলিওর বোধগম্য হয়েছে। কোনও এক ব্যক্তি টোয়াবেনির আস্তানায় তাঁর উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল বলেই জুতোর ছাপগুলো হয়েছে অদৃশ্য, এবং উক্ত ব্যক্তির পরিচয় আর উদ্দেশ্যও এখন তাঁর কাছে গোপন নেই :

সিংহের মুখে যদি তাঁর দেহটা টোয়াবেনির ক্রাল ছেড়ে অদৃশ্য হতো, তবে কারও পক্ষে সঠিক ঘটনাটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না; কারণ, আত্তিলিও যে অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন সে কথা জানতো শুধু টোয়াবেনি। হ্যাঁ, ম্‌দাবুলিও জানতো আত্তিলিওর উপস্থিতি—কিন্তু নরখাদক সিংহ তার নিকটস্থ দুটি মানুষকে জীবিত রাখতো কি ? অতএব দেখা যাচ্ছে জুতো পরা পায়ের ছাপগুলো যদি মুছে ফেলা যায়, তাহলে সিংহের কবলগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের উপস্থিতির আর প্রমাণ থাকে না তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, বনের জানোয়ার মানুষের ইচ্ছা পূরণ করবে কেন ? তা করবে না, কিন্তু বন্ধ দরজা যদি হঠাৎ খুলে গিয়ে খাদ্যসংগ্রহের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তবে সবচেয়ে কাছাকাছি জ্যান্ত খাবারের দিকেই এগিয়ে আসবে মাংস লোলুপ শ্বাপদ এবং ম্‌দাবুলির যে কুঁড়ে ঘরটাতে আত্তিলিও ঢুকেছিলেন সেটা যে দরজার সবচেয়ে

নিকটবর্তী কুটির সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি নিখুঁত। গোলমাল শুনে অন্যান্য কুটির থেকে বেরিয়ে এসে জুলুর কেউ আত্তিলিওর জুতোর ছাপ দেখতে পেতো না। আত্তিলিও যদি সিংহের মুখে উধাও হতেন, তবে তো কথাই নেই—কিন্তু যদি তাঁকে ফেলে ম্‌দাবুলিকে তুলে নিতো তাহলেও নিকটেই অবস্থিত আত্তিলিওকে নিশ্চয়ই সে জ্যান্ত রাখতো না, এবং নখেদন্তে ছিন্নভিন্ন অভিযাত্রীর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে টোয়াবেনি যখন শপথ করে বলতো তার অজ্ঞাতসারে সাদা মানুষটি ম্‌দাবুলির কুটিরে প্রবেশ করেছে, তখন তার কথাই অভ্রান্ত সত্য বলে গৃহীত হতো—এমন কি সর্বাধিনায়ক জিপোসোর মতো বুদ্ধিমান মানুষও আত্তিলিওর মৃত্যুর জন্য নরখাদক সিংহকেই দায়ী করতো—কাঁটার বেড়াতে ঘের আস্তানার মধ্যে সিংহের অনুপ্রবেশ; কি করে ঘটল তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না।

আত্তিলিও মাথা ঘামালেন। জুতোর ছাপ যে কি ভাবে ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে—তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি পড়ল টোয়াবেনির পায়ের উপর—ধুলোতে সাদা হয়ে গেছে দুই পা!

'আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল,' আত্তিলিওর ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল, 'তবে ঐ দরজাটা খুব চমৎকার। খুবই কার্যকরী দরজা। এবার ওটা দয়া করে খুলে দাও, আমি বাইরে যাব।'

আত্তিলিও ভেবেছিলেন টোয়াবেনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, চীৎকার করে অভিশাপ দেবে, হাতের বর্শা তুলে মারতে আসবে—কিন্তু নাঃ! সেরকম কিছুই সে করল না! এক গাল হেসে দড়ি ধরে টান মারল টোয়াবেনি, দরজা খুলে গেল—আর দরজা খোলার সময়ে তার একটা পা এসে পড়ল অবশিষ্ট একমাত্র জুতোর ছাপটার উপর। 'ঐ ছাপটাকে অবহেলা করা ঠিক হয়নি,' আত্তিলিও বললেন, 'কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে, ওটা আমি দেখে ফেলেছি।'

এখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আত্তিলিও—তিনি আর

ম্‌দাবুলি যখন কথা বলেছিলেন তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি মেয়ের সব কথা শুনেছে টৌয়াবেনি, তারপর ফিরে গিয়ে নিজস্ব কুটিরের নিরাপদ স্থান থেকে দড়ি টেনে দরজা খুলে দিয়ে পরম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে ক্ষুধার্ত সিংহের জন্য—সে জানতো চারদিকে ওত পেতে বসে আছে দলে দলে নরখাদক শ্বাপদ, দরজা খোলা থাকলে এক বা একাধিক সিংহের আবির্ভাব ঘটবেই ঘটবে। টৌয়াবেনি যা ভেবেছিল তাই হল। খোলা দরজা দিয়ে একসময়ে প্রবেশ করেছে পূর্বোক্ত সিংহ ; শয়তান যাদুকরও সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করতে একটুও দেরি করে নি! তারপর সে অবাধ্য কন্যা ও পরচর্চায় নিযুক্ত সাদা মানুষটার অপঘাত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছে সাগ্রহে। সিংহ তার শিকার নিয়ে ম্‌দাবুলির কুটির থেকে বেরিয়ে এলেই সে আবার দড়ি টেনে শ্বাপদের পলায়নের পথ মুক্ত করে দিতো—কিন্তু এমন চমৎকার পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল রাইফেলের অগ্নিবর্ষী মহিমায়! গুলির আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে এসেছে টৌয়াবেনি— সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেছে সর্বনাশ হয়েছে, সব কিছু ভেস্তে দিয়েছে সাদা মানুষের রাইফেল ····

উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁবুর দিকে পা চালালেন আত্তিলিও। পথের মধ্যে আর কোনও সিংহের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি! অন্যদিনের মতো সিংহ শিকারের চেষ্টা করলেন না তিনি। সিংহের আকস্মিক আক্রমণ তাঁকে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল—অন্ততঃ সেদিনটা তিনি ঐ ভয়ঙ্কর জীবের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন। নরখাদকের চাইতে নরঘাতকের দুরভিসন্ধির কথা ভেবেই তিনি বেশি উদ্বেগ বোধ করছিলেন,—তিনি বুঝেছিলেন ম্‌দাবুলি আর ন্‌গো এখন মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে শয়তানের চক্রান্তে তাদের প্রাণহানি ঘটতে পারে। আত্তিলিও যে তার শয়তানি ধরে ফেলেছিলেন, সিংহের আবির্ভাবের রহস্য যে তাঁর কাছে গোপনীয় নেই, সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে টৌয়াবেনি—অতএব আত্তিলিওর উপরেও সে হামলা চালাতে পারে যখন-তখন

এবং সেই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা যে কম্যাণ্ডার সাহেবের মনে উঁকি দেয়নি তা নয়।

কাল সকালে উঠে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে জিপোসোর সঙ্গে দেখা করা।—আস্তিলিও মনে মনে বললেন। তিনি জানতেন সর্বাধিনায়ক তাঁর কথা বিশ্বাস করবে।

তাঁবুতে ঢুকতেই জামানি তাঁকে জানাল পরিস্থিতি খুব খারাপ। সারাদিন ধরে টমটম (ঢাক) বেজেছে। ঐ শব্দের সূত্র ধরে জানা গেছে যে, দলবদ্ধ সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে জুলুদের দুটি আস্তানা। বিল আর প্রফেসর বিশ্রাম নিতে তাঁবুতেও এসেছিলেন, সিংহ ঘটিত দুঃসংবাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তাঁরা ওষুধপত্র আর রাইফেল নিয়ে অকুস্থলের দিকে ছুটে গেছেন। তবে আরও খারাপ খবর আছে—জুলুল্যাণ্ডের পশ্চিমঅংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

'বিদ্রোহ! কার বিরুদ্ধে?' চমকে প্রশ্ন করলেন আস্তিলিও।

'জাতির মাতব্বর আর যাদুকরদের বিরুদ্ধে', জামানি বলল, 'ওরা সিম্বাদের (সিংহদের) থামাতে পারছে না বা থামাচ্ছে না। একজন জুলু সর্দারকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়েছে। জিপোসোর হয়ে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিল ঐ সর্দার। তার অনুচরকে তীর মেরে খুন করা হয়েছে শুনে জিপোসো ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে, সে চলে গেছে হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে—সঙ্গে গেছে জুলুল্যাণ্ডের সেরা দু'শ যোদ্ধা।'

'বাঃ! চমৎকার!' আস্তিলিও ভাবলেন, 'জিপোসোর কাছ থেকে এখন আর কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'আর সুকামবানা'—জামানি আবার বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেল।

সুকামবানা নামক লোকটিকে চিনতেন আস্তিলিও। সে ছিল জুলু-শিকারীদের যাদুকর, অত্যন্ত বেয়াড়া ধরনের লোক—টোয়াবেনির স্বল্প সংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। ধাঁ করে আস্তিলিওর মাথার ভিতর একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল—

সুকামবনা আর টৈয়াবেনির অশুভ যোগাযোগ কোনও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সূচনা করছে না তো ?……

নৈশভোজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আত্তিলিও তাঁর তাঁবুতে জামানিকে ডেকে পাঠালেন। জামানি সহজ ভাবেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, কারণ, প্রত্যেক রাতেই পরের দিনের কর্মসূচী সে আত্তিলিওর কাছে জানতে পারতো। কিন্তু সে সব কথা না তুলে মাসাংগা যখন তাকে সুকামবানার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে ঘাবড়ে গেল। মুখ ফসকে দু'একটা কথা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জামানি তখন মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে, কিন্তু এখন আর আত্তিলিও তাকে ছাড়তে রাজী নন—জেরার মুখে সে আরও কয়েকটা গোপনীয় কথা ফাঁস করে ফেলল। শেষকালে আত্তিলিও যখন শপথ করে বললেন সর্বাধিনায়ক জিপোসোকে তিনি কিছু বলবেন না, তখনই সব কিছু খুলে বলতে রাজী হল জামানি।

জামানির বক্তব্য সংক্ষেপে পরিবেশিত হলে যা হয় তা হচ্ছে এই—

বর্ষার দেবতা 'আনজিয়ানা' জুলুদের পূজা প্রার্থনা আর কাকুতি-মিনতি শুনেও অবিচলিত ; বৃষ্টির নাম নেই, খরদাহে জ্বলছে জুলুদের দেশ, সিংহরা সংখ্যায় বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে তাদের সাহস আর ঔদ্ধত্য—জন্তুগুলো এখন আর মানুষকে ভয় করে না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য জুলুল্যাণ্ডের মানুষ অতীন্দ্রিয় জগৎকে অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের দায়ী করছে এবং অবিলম্বে এই অসহ্য অবস্থার অবসান করার জন্য যাদুকরদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আত্তিলিওর কাছে টৌয়াবেনি বলেছিল তার ছেলেরা নাকি টৌয়াবেনির এক ভাই-এর ক্রালে গেছে একটা বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করতে—কথাটা আদপেই সত্যি নয়। একদল ক্ষিপ্ত জুলুকে সংঘবদ্ধ করার জন্য টৌয়াবেনির ছেলেরা যেখানে গিয়েছিল সেটি হচ্ছে আর এক শয়তানের আস্তানা—সুকামবানার ক্রাল!

জামানির বক্তব্য থেকে আরও একটি তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ

হলেন আত্তিলিও—সুকামবানার সঙ্গে নাকি জরুরী পরামর্শ করেছেন 'আনজিয়ানা' স্বয়ং! এই অতি মূল্যবান সংবাদটি অবশ্য সুকামবানা নিজেই জুলুদের জানিয়েছে, জামানিও বাদ যায় নি।

এই পর্যন্ত বলেই জামানি হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল, তার কথাগুলো মুখের ভিতর আটকে যেতে লাগল বার বার; ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ফিস ফিস করে ভয়ার্ত জামানি যা বলল তা থেকে আত্তিলিও বুঝলেন সুকামবানা নাকি সবাইকে বলেছে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী হচ্ছে এক জুলুযোদ্ধা! সুকামবানার মতে উক্ত জুলুযোদ্ধার চোখদুটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে অমঙ্গলের অভিশাপ, এবং এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ করতে হলে অবিলম্বে অভিশপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট ঐ মানুষটিকে শাস্তি দেওয়া দরকার—কিন্তু অনেক মানুষের ভিড়ের ভিতর থেকে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হলে 'গন্ধ বিচারের' সভায় যে মানুষটি ঐভাবে বিচার করতে সক্ষম, সেই অদ্বিতীয় যাদুকরকে তার অধিকৃত পদ থেকে খারিজ করে তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে ঈর্ষা-কাতর জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভা এবং সর্দার জিপোসো। বর্ষার দেবতা আনজিয়ানা এই অবিচারে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, অনাবৃষ্টির জন্য জিপোসোর অবিচারও কিছুটা দায়ী বলে মতপ্রকাশ করেছে সুকামবানা।

জিপোসো এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিচারে টোয়াবেনিকে যে দোষী সাব্যস্ত করে যাদুকরের সম্মানিত পদ থেকে বিচ্যুত করা হয় তা শুনেছিলেন আত্তিলিও—অতএব তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন সুকামবানার উল্লিখিত যাদুকরটি টোয়াবেনি ছাড়া আর কেউ নয়।

জামানির কাছ থেকে আরও একটি সংবাদ জানতে পারলেন আত্তিলিও। সংবাদটি হচ্ছে এই—

জিপোসো বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করার আগে সুকামবানা গন্ধের সাহায্যে বিচার করার অনুমতি চেয়েছিল। জিপোসো অনুমতি দেয় নি। সে জানতো 'গন্ধ-বিচার' অনিবার্যভাবেই নরহত্যা ঘটাবে, এমনকি গণহত্যার মতো বীভৎস কাণ্ড ঘটাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু জিপোপো এখন অনুপস্থিত, সুকামবানা আর টোয়াবেনিকে বাধা দেবে কে ? আত্তিলিও বললেন, "তাহলে নিশ্চয়ই কাল ওরা গন্ধ-বিচারের সভা ডাকছে।"

'না, না, কাল নয়' জামানি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কাল নয় মাসাংগা, কাল কিছু হবে না।'

'তবে ? কবে হবে ঐ বিদঘুটে কাণ্ড ?'

জবাব নেই। জামানি আবার বোবা। 'মাসাংগার' অনেক অনুরোধ-উপরোধেও তার মৌনভঙ্গ হল না।

পরের দিন কোথাও গেলেন না আত্তিলিও, তাঁবুতেই বসে থাকলেন। ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আত্তিলিও ঢাকের ভাষা জানেন না, কিন্তু ঘন ঘন দ্রুততালে সেই ধ্বনিতরঙ্গের প্রবল উত্তেজনা তিনি অনুভব করতে পারলেন। ঢাক কি বলছে জানার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু জানবো কি করে ? তাঁবুর নিগ্রোরা হঠাৎ ঢাকের ভাষা ভুলে গেছে! আত্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর জামানিও ব্যতিক্রম নয়! বার বার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেলেন আত্তিলিও—ঢাকের ভাষা তারা নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না! এক রাতের মধ্যে আয়ত্ত-বিদ্যার এমন হঠাৎ-বিলুপ্তি এবং স্মরণশক্তির এমন আকস্মিক বিপর্যয় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আত্তিলিও !......

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ গন্ধের বিচার

রাত এল। যথা নিয়মে আবার এল প্রভাত। আজ আর ঢাক বাজছে না। আগের দিনের অবিরাম ধ্বনি-তরঙ্গের পরে এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন ভয়ংকর এক ঘটনার পূর্বাভাস।

আত্তিলিও উঠে দাঁড়ালেন, জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হলেন, তারপর পদার্পণ করলেন তাঁবুর বাইরে। জামানিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আমি টোয়াবেনির কাছে যাচ্ছি। তুমিও সঙ্গে চলো।

আত্তিলিও যা ভেবেছিলেন তাই হল—জামানি তাঁর আদেশ অমান্য করে দাঁড়িয়ে রইল এবং বার বার তাঁকে তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে নিষেধ করল। সে একথাও বলল তার নিষেধ অগ্রাহ্য করা মাসাংগার উচিত নয়।

আত্তিলিও শুনলেন না। তিনি জানতেন জামানি তাঁকে ভালবাসে, তাঁর বিপদ হতে পারে বলেই সে তাঁকে কোথাও যেতে বারণ করছে। কিন্তু আত্তিলিওর কানে তখনও বাজছে জুলু বালিকার কাতর প্রার্থনা—'জা বাব, আমি সাহায্য চাই।'

আত্তিলিও অনুমান করেছিলেন মৃদাবুলি আর নগোর সর্বনাশ করার জন্য এক চক্রান্তের জাল বুনছে দুই শয়তান—টোয়াবেনি ও সুকামবানা। চক্রান্তকারীদের কি করে বাধা দেবেন সে কথা আত্তিলিও নিজেও ভাবতে পারেন নি, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রের চেহারাটা তখন পর্যন্ত তাঁর কাছে অস্পষ্ট—কিন্তু যে ভয়াবহ বিপদের ফলে দুটি নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে, তাতে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া উচিত মনে করেই তিনি টোয়াবেনির আস্তানা লক্ষ্য করে যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল নিত্য সঙ্গী রাইফেল আর ক্যামেরা। পথে যেতে একটা সিংহের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। ক্যামেরার সাহায্যে পশুরাজের আলোকচিত্র গ্রহণ করতেও তাঁর ভুল হয়নি। সিংহটা তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা না করে বিলক্ষণ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সেদিন সকালে গুলির আওয়াজে জুলুদের কাছে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে রাজী ছিলেন না আত্তিলিও।

প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটে তিনি টোয়াবেনির ক্রালের নিকটে অবস্থিত পাহাড়ের উপর এসে পৌঁছালেন। সেখান থেকে চারদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করে তিনি দেখলেন তাঁর উল্টোদিকে যে পাহাড়টার উপর এই সময়ে টোয়াবেনির গরুগুলো ঘাস খেয়ে বেড়ায়, সেখানে তারা নেই—গরুগুলোকে ক্রালের ভিতর তাদেরই নির্দিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে আজ বন্দী করে রাখা হয়েছে। আস্তানার দরজাটা খোলা

এবং সেই উন্মুক্ত প্রবেশ-পথের মুখে ভিড় করেছে জুলু-রমনীর দল। দ্বারের বাইরের ছোট ছোট কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে উত্তেজিত স্বরে কথা কইছে প্রায় শ'খানেক পুরুষ। বিস্তীর্ণ মাঠের এখানে ওখানে কালো-কালো ছাপ দেখে আত্তিলিও বুঝলেন, যে সব ঝোপঝাড় বা শুষ্ক নালার মধ্যে সিংহের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা ছিল সেই জায়গাগুলো জুলুরা আগুনে পুড়িয়ে সাফ করে ফেলেছে।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন আত্তিলিও। এই মুহূর্তে পিছন ফিরে তিনি যদি যাত্রা করেন তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যেখানে আছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদের ভয় নেই। কিন্তু অতদূর থেকে কিছু দেখা বা শোনার আশা তাহলে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। সামনে এগিয়ে গেলে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তবে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নিলে হয়তো তিনি এমন দৃশ্য দেখতে পাবেন যা ইতিপূর্বে ইউরোপে বা আমেরিকারবাসী কোন শ্বেতাঙ্গেব দৃষ্টিগোচর হয়নি। হয়তো এসব দুর্লভ দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করার সুযোগও পেতে পারেন তিনি, এবং—

এবং বরাত ভাল থাকলে রক্তারক্তির ভয়াবহ সম্ভাবনাকেও হয়তো রোধ করতে পারবেন।

মুহূর্তের আবেগে পরিচালিত হলেন আত্তিলিও, হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে তিনি পাহাড় ভেঙ্গে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। আত্তিলিও ভেবেছিলেন নিরস্ত্র অবস্থায় গেলে জুলুরা নিশ্চয়ই তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে না। তাছাড়া রাইফেল এখন কোন্ কাজে লাগবে? অবস্থা যদি ঘোরালো হয়, তবে শ'খানেক বর্শার বিরুদ্ধে একটা রাইফেল নিয়ে তিনি কি করতে পারেন?

পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে নামতে তিনি যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছেন সেই সময়ে হঠাৎ জনতার ভিতর থেকে একটি উত্তেজিত তীব্রস্বর সকলকে সাবধান করে দিল।

একশ' লোকের জনতা এক মুহূর্তে চুপ, সকলেরই দৃষ্টি পড়েছে আত্তিলিওর দিকে।

পাহাড়ে মাঝামাঝি নেমে এলেন আত্তিলিও। জনতা কথা কইল না, নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল। নীচু জায়গাটা পার হয়ে পরবর্তী উচ্চভূমির উপর পা রাখলেন আত্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল মৌন জনতা! সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়!

উঁচু জমি পার হয়ে আত্তিলিও এসে দাঁড়ালেন জুলুদের মাঝখানে —তৎক্ষণাৎ চিৎকার, গোলমাল, হৈ হৈ, ধুন্ধুমার কাণ্ড!

আত্তিলিও জুলুদের কাছে বিনীত ভদ্র ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত, কিন্তু জনতার মধ্যে কেউ তাঁকে ভদ্রতাসূচক অভিবাদন জানিয়ে অভ্যর্থনা করল না। ভদ্রতা, শিষ্টতা প্রভৃতি সৌজন্যবোধ সেদিন জুলুদের ভিতর থেকে অন্তর্ধান করেছে—সাদা মানুষের অনধিকার চর্চায় তারা বিরক্ত, কয়েকজন আবার বিরূপ মনোভাব গোপন করতেও চাইল না। আত্তিলিও দেখেও দেখলেন না, বুঝেও বুঝলেন না, সোল্লাসে হাত নেড়ে তিনি জুলুদের অভিবাদন জানালেন, 'সালাগাতলে!'

একজন উত্তর দিল। সেই একজন অবশ্য খুব সাধারণ মানুষ নয় যে লোকটি আত্তিলিওর অভিবাদানে সাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে জুলুদের মধ্যে এক প্রাচীন ইনডানা (জ্ঞানী ব্যক্তি)। সাহস ও বীরত্বের জন্য সে যৌবনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং জুলুদের সামাজিক ব্যাপারে তার মতামতের মূল্য ছিল খুব বেশী।

ঐ বিশিষ্ট লোকটির সঙ্গে আত্তিলিও সাহেবের যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে কোনও তরফ থেকেই কৃত্রিমতার স্থান ছিল না।

স্খলিত চরণে এগিয়ে এসে পূর্বোক্ত ইনডানা আত্তিলির হাতে হাত দিয়ে করমর্দন করল।

আত্তিলিও বললেন, 'ওদের জানিয়ে দাও আমি এখানে দর্শক

হিসাবে এসেছি। যা দেখব, যা শুনব, সে কথা আমি শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের কাছে বলব না।'

ভীষণ চ্যাঁচামেচি গোলমাল হচ্ছিল। হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল ইনডানা। কয়েক মিনিট ধরে নির্বাক জুলুজনতাকে উদ্দেশ্য করে সে কথা বলল। প্রথমেই সে জনতাকে জানিয়ে দিল সাদা মানুষের সঙ্গে 'ম্যাজিকের বাক্স' (ক্যামেরা) ছাড়া কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, অতএব তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। তারপর অভিযাত্রীদের সততা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে সাদা মানুষদের বিভিন্ন কীর্তিকলাপের কথা বলতে আরম্ভ করল—সিংহের আক্রমণে আহত জুলুদের চিকিৎসা করে অভিযাত্রীরা যে অনেককে বাঁচিয়ে তুলেছেন সেইসব কথা সে উল্লেখ করল, সিংহ শিকারের কথা দাঁতের ব্যাথা উপশম করে জুলুদের আরাম দেওয়ার ইতিহাস প্রভৃতি সব ঘটনার কথাই সে বলেছিল এবং পরিশেষে সাদা মানুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান উপহারগুলোর কথাও সে জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না।

ইনডানার কথা শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল সুকামবানা। ঝড়ের বেগে সে অনেক কথাই বলে গেল। উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত সেই দ্রুত বাক্যঝটিকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে—

'চুলোয় যাক সাদা মানুষরা!'

জনতা এইবার একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। জনতার এক অংশ জানাল আত্তিলিওর উপস্থিত তাদের কাছে আপত্তিকর নয়, অপর-অংশ বিদেশীকে ঘটনাস্থলে থাকতে দিতে অসম্মত। আত্তিলিও কোন দিকে নজর দিলেন না, নির্লিপ্তভাবে তিনি 'ম্যাজিকের বাক্স' হাতে ফটো তুলতে শুরু করলেন।

সুখের বিষয় অকুস্থলে টোয়াবেনি উপস্থিত ছিল না। সে থাকলে হাওয়া বদলে যেতো। আত্তিলিও পূর্বোক্ত ইনডানাকে ভোটের সাহায্য সমস্যার সমাধান করতে বললেন। ভোট নেওয়া হল। শূন্যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল অনেকগুলো বর্শাফলক

—অধিকাংশ মানুষই হাতের অস্ত্র তুলে ধরে আত্তিলিওর স্বপক্ষে রায় দিল। যারা বিদেশীর উপস্থিতি চায় নি, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি মেনে নিল। এই ব্যাপারে সুকামবানার আর কিছু বলার উপায় থাকল না। জনতাকে উদ্দেশ্য করে সে একটি হুকুম দিল, সঙ্গে সঙ্গে আত্তিলিওর উপস্থিতি ভুলে গেল জনতা—সুকামবানা আর জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝখানে রেখে তারা গোল হয়ে বসে পড়ল।

তারপর বৃত্তাকারে উপবিষ্ট জনতার ভিতর থেকে জাগল মিলিত-কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি। খুব ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে গান গাইছে জনতা। ঐকতান সঙ্গীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুটির থেকে বেরিয়ে এল টোয়াবেনি। চতুর্দিকে দণ্ডায়মান জুলু মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল, বৃত্তাকারে উপবিষ্ট পুরুষরা বৃত্ত ভেঙ্গে তাকে মধ্যস্থলে প্রবেশ করার পথ ছেড়ে দিল। টোয়াবেনি কারও দিকে চাইল না, তার গতিবিধি এখন সম্মোহিত ব্যক্তির মতো আঁড়ষ্ট এবং তার ভাবলেশ-হীন চক্ষু-দুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে একটা শাণিত বর্শাফলকের উপর। ঐ বর্শাটাকে মাটিতে পুঁতে তার চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল পুরুষের দল।

টোয়াবেনির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনি উচ্চস্বরে বেজে উঠল। জনতার ঐকতানধ্বনি আর টোয়াবেনির পাতলা ছিপছিপে শরীরটা দুলতে লাগল একবার সামনে, একবার পিছনে···তীব্রতম পর্যায়ে উঠে গেল গায়কদের কণ্ঠস্বর···উদারা, মুদারা, তারা···তারপর আবার নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল সুরের ঢেউ, মৃদু থেকে হল মৃদুতর, অস্পষ্ট—এবং পরিশেষে বিরাম লাভ করল স্তব্ধতার গর্ভে। গান থামল। এখন মৌন জনতার নির্নিমেষ দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য হল টোয়াবেনি। আত্তিলিও অনুভব করলেন এক ভয়ঙ্কর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে নির্বাক মানুষগুলো।

টোয়াবেনির নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত; তার দেহে বুঝি ভর করেছে

প্রেতাত্মা। আচম্বিতে এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে সে ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত বর্শার কাছ থেকে ছিটকে অনেক দূরে এসে পড়ল, তারপর ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জুলু-যোদ্ধার দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করল। আবার ঘুরে এসে সে, লাফিয়ে লাফিয়ে যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে আবার শুঁকতে লাগল। এক একটি লোককে দু'বার, তিনবার করে সে শুঁকল, তবু শেষ হল না গন্ধের বিচার এবং ক্লান্ত হল না টোয়াবেনি, যন্ত্রের মতো লাফাতে লাফাতে সে যোদ্ধাদের দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগল বারংবার······

আণ্ডিলিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এইভাবে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কি করে? অনেকেই, বিশেষ করে অভিজ্ঞ শিকারীরা জানেন, মানুষ অথবা জানোয়ার ভয় পেলে তাদের শরীর থেকে এক ধরনের গন্ধ নির্গত হয়,—কিন্তু সেই গন্ধকে আবিষ্কার করতে পারে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর পশুর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়। হয়তো দীর্ঘকাল অনুশীলন করার ফলে বন্যপরিবেশের মানুষ টোয়াবেনি ঐ বিদ্যাকে আয়ত্ত করেছে, হয়তো সত্যিকার অপরাধীকে ঐ ভাবে আবিষ্কার করা তার অসম্ভব নয়—কারণ, ভীত অপরাধীর দেহ নিঃসৃত ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে ভয়ের গন্ধ এবং অনুশীলন করে যদি কেউ ঐ গন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে, তবে তার পক্ষে অপরাধীকে সনাক্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য কোনও মানুষ অপরাধ বোধ করে ভয়ার্ত হয়ে উঠবে না, কাজেই গন্ধের বিচার এখানে একেবারেই অকেজো। জুলুদের পক্ষে সব কিছুই বিশ্বাস করা সম্ভব হলেও আণ্ডিলিওর পক্ষে এমন কড়া গাঁজা হজম করা দুঃসাধ্য।

'ঐ যে! ঐ যে সেই লোক, যার দুই চোখে জড়িয়ে আছে অমঙ্গলের অভিশাপ!'—তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠল টোয়াবেনি। জনতা এককণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

শূন্যে লাফিয়ে উঠল একশ' যোদ্ধা, তাদের ঘর্মাক্ত দেহে চক চক করে উঠল মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি।

একটি লোকের হাত চেপে ধরল টোয়াবেনি, শুরু হল ধস্তাধস্তি।

জনতা ছুটে এসে দুজনকে ঘিরে ফেলল। অত লোকের ছুটো-পুটির ভিতর ধৃত ব্যক্তির চেহারা দেখতে পেলেন না আত্তিলিও, তবে বুঝলেন গন্ধের বিচার শেষ হয়েছে—

ধরা পড়েছে অপরাধী!

নবম পরিচ্ছেদ : ক্রুদ্ধ জনতা

আত্তিলিও অবাক হয়ে ভাবছেন টোয়াবেনির ষড়যন্ত্রের শিকার কে হতে পারে,—হঠাৎ তাঁর পাশ কাটিয়ে কেউ যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। তিনি ঘুরে দেখলেন; একটি মেয়ে। সে ছুটছিল তীরবেগে, পিছন থেকে তার মুখ দেখতে পেলেন না আত্তিলিও, তবু মেয়েটি কে তিনি চিনতে পারলেন—ম্‌দাবুলি! তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন আত্তিলিও; তাকে কেউ দেখতে পায় নি—সকলেরই ব্যগ্র দৃষ্টি সেইখানে, যেখানে জুলুযোদ্ধাদের মাঝখানে টোয়াবেনির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে একটি হতভাগ্য মানুষ। জনারণ্যের ভিতর থেকে তার চেহারা দেখতে না পেলেও ম্‌দাবুলির আচরণেই আত্তিলিও বুঝে গেছেন টোয়াবেনির কবলে পড়ে যে মানুষটি ছটফট করছে সে ন্‌গো ছাড়া আর কেউ নয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান জুলু-বালিকার উদ্দেশ্যও তিনি ধরে ফেলেছেন—সে ছুটে চলেছে সর্বাধিনায়ক জিপোসোর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

আত্তিলিওর ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

চারদিকে অগণিত নরখাদক সিংহের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি এড়িয়ে অরণ্য-প্রান্তর ও পর্বতের দুস্তর বাধা ভেদ করে বালিকা কি জিপোসোর সঙ্গে দেখা করতে পারবে? পারবে কি সেই লোকটাকে বাঁচাতে যে এখন ছটফট করছে ক্ষিপ্ত কুসংস্কার-অন্ধ জনতার মধ্যে?…

হ্যাঁ, ছটফট করছে ন্‌গো, তাকে চেপে ধরেছে ক্রুদ্ধ জনতা। একদল জুলুযোদ্ধা তাকে শূন্যে তুলে ফেলল, তারপর হাতে হাতে

তাকে তুলে নিয়ে এল একটা মস্ত গাছের নীচে। আত্তিলিও গাছটার দিকে তাকালেন, পত্রবিহীন ঐ বিশাল শুষ্ক বৃক্ষটির নাম তিনি শুনেছেন—"যাতনাদায়ক বৃক্ষ।" তার জুলু অনুচর জামানি একদিন তাঁকে পূর্বোক্ত গাছটির নাম এবং কার্যকারিতা সবিস্তারে জানিয়ে দিয়েছিল। জামানির মুখ থেকেই আত্তিলিও শুনেছেন, যে, গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে প্রাচীন কালে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হতো—রজ্জুবদ্ধ অপরাধীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচগান চালাতো বর্শাধারী যোদ্ধার দল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খুঁচিয়ে মারতো ঐ হতভাগ্য মানুষটিকে···

আত্তিলিও সচমকে ভাবলেন তাঁকেও কি আজ ঐরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দর্শক হতে হবে? তাছাড়া আর একটা ভীষণ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে হল—

নরমাংসের স্বাদ গ্রহণ করলেই সিংহ যেমন মানুষ-খেকো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই মানুষের ভিতরকার পশুও রক্তপাতের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে—নৃগের রক্তপাতে উল্লসিত জনতার মধ্যে যদি রক্তের তৃষ্ণা জাগে, তাহলে তারা কি আত্তিলিওকে রেহাই দেবে?···

ইতিমধ্যেই তাদের পরিবর্তন এসেছে। শান্তশিষ্ট মানুষগুলো বন্য পশুর মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, তাদের চোখেমুখে এখন রক্তলোলুপ শ্বাপদের হিংস্র অভিব্যক্তি!

আত্তিলিওর পাদুটো তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল সেইখানে, যেখানে পড়ে আছে তাঁর রাইফেল—প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তিনি পলায়নের ইচ্ছা দমন করলেন।

ষোল বছরের একটি বালিকা যদি এই ক্ষিপ্ত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, নিরপরাধ মানুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্য ঐটুকু মেয়ে যদি চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান শত শত নরখাদক সিংহের ভয়াবহ উপস্থিতি অগ্রাহ্য করতে পারে, তবে আত্তিলিওর মতো একজন সৈনিক পুরুষের পক্ষে পালিয়ে আত্মরক্ষার চিন্তা করাও অন্যায়।

তিনি পলায়নের ইচ্ছা দমন করে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন
হওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলেন।

চারপাশে দণ্ডায়মান জনতা ও ন্‌গোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন
আত্তিলিও—ক্রুদ্ধ জনতার আস্ফালন এখন থেমে গেছে, তারা
ধীরভাবে অপেক্ষা করছে ইনডানাদের কথা শোনার জন্য। যতই
রাগ হোক, জুলুরা 'ইনডানা' উপাধিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামত
এখনও অগ্রাহ্য করে না। সব সমেত তিনজন ইনডানা সেখানে
উপস্থিত ছিল।

প্রথমেই এগিয়ে এল সেই ইনডানা, যে প্রথমেই আত্তিলিওর
সঙ্গে করমর্দন করেছিল। ঐ লোকটি ন্‌গোর কাছে জানতে চাইল সে
অপরাধ স্বীকার করতে রাজী আছে কি না। ন্‌গো জানাল সে
নিরপরাধ। ইনডানাটি তখন জনতাকে জিপোসোর জন্য অপেক্ষা
করতে অনুরোধ করল। তার কথার ভঙ্গীতে বোঝা গেল ন্‌গোর
অপরাধ সম্বন্ধে সে নিজেও নিঃসন্দেহ নয়।

এইবার দু'নম্বর ইনডানা তার অভিমত প্রকাশ করল। তার
কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে গাছের সঙ্গে বেঁধে ন্‌গোকে মেরে ফেলা
উচিত। জুলুদের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ধীরে ধীরে খুঁচিয়ে মারার
পক্ষপাতী নয়, চটপট মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতেই সে ব্যগ্র—কারণ,
জিপোসো অকুস্থলে এসে পড়লে এই মৃত্যদণ্ড সে সমর্থন করবে
কি না এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শব্দায়মান ঢাকের আকস্মিক
নীরবতায় সন্দিগ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে অকুস্থলে এসে
পড়ে সব ওলট-পালট করে দিতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও
জনতাকে সে জানিয়ে দিল এবং 'শুভকার্যে' বিলম্ব না করাই
বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে পরবর্তী বক্তাকে স্থান ছেড়ে দিল।

জনতার একাংশ প্রবল হর্ষধ্বনিতে সমর্থন জানাল, আর
একদলের তরফ থেকে শোনা গেল শ্লেষতিক্ত ব্যঙ্গধ্বনি!

এইবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তিন নম্বর ইনডানা। তার বক্তব্য

হচ্ছে, চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিচার না করলে অন্যায় হবে: অতএব গরম জলের সাহায্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়ের যে প্রাচীন প্রথা আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারেই ন্‌গোর বিচার হওয়া দরকার। ন্‌গোর ডান হাত ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে যদি দেখা যায় সে অক্ষত আছে, তবেই বোঝা যাবে সে নির্দোষ।

জনতা সোল্লাসে চিৎকার করে এই প্রস্তাব সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ভিতর থেকে একটা মস্ত বড় হাঁড়ি নিয়ে এল টোয়াবেনি। আত্তিলিও বুঝলেন, শয়তানটা আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল। নগোর সামনে ফুটন্ত গরম জলের হাঁড়ি রাখা হল। সে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু শয়তান টোয়াবেনি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে ন্‌গোর ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল হাঁড়ির ভিতর।

কয়েক মুহূর্ত···ন্‌গোর হাত ছেড়ে দিল টোয়াবেনি···সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিতে ডান হাত চেপে ধরে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল ন্‌গো—গরমজল তার হাতটাকে ঝলসে দিয়েছে!

'ওই হচ্ছে অপরাধী,' চেঁচিয়ে উঠল সুকামবানা, 'বেঁধে ফ্যালো ওকে গাছের সঙ্গে তারপর ধীরে ধীরে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে ওকে শেষ করে দাও। শয়তান ন্‌গোই বৃষ্টি বন্ধ করেছে আর সিম্বাদের (সিংহদের) লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর।'

তৎক্ষণাৎ জনবারো বলিষ্ঠ যোদ্ধা ন্‌গোকে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে ঘিরে শুরু হল উদ্দাম নৃত্য। নাচতে নাচতে বর্শাধারী যোদ্ধারা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ন্‌গোকে মাঝখানে রেখে। ন্‌গোর সামনে দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময়ে প্রত্যেক যোদ্ধা তাঁর দেহলক্ষ্য করে সজোরে বর্শা চালনা করতে লাগল এবং এমন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে চালিত বর্শা ফলকের গতিবেগ তারা রোধ করছিল যে, লক্ষস্থলের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে এসেই থেমে যাচ্ছিল অস্ত্রের শাণিত ফলক!

এখনও সময় হয়নি—

ধীরে ধীরে কমে আসবে লক্ষ্যস্থল ও দংশন-উন্নত বর্শাফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব, মৃদু আঘাতে রক্ত পান করবে একটির পর একটি শাণিত বর্শা, অজস্র অগভীর ক্ষত থেকে ঝরতে থাকবে রক্তের ধারা, তারপর একসময়ে প্রচণ্ড আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে হতভাগ্য ন্‌গোর হৃৎপিণ্ড! কিন্তু—

কিন্তু নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট হয়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখার জন্যই কি অপেক্ষা করছেন আত্তিলিও?

দশম পরিচ্ছেদ: যাদুকরের ভূমিকায় আত্তিলিও

অনাবৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, চিরস্থায়ী হতে পারে না। আত্তিলিও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—নাঃ, কোনও আশা নেই, এখানে সেখানে কিছু কিছু মেঘ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু বৃষ্টি সুদূর পরাহত।

'পকেট ব্যারোমিটার' নামক যে ছোট যন্ত্রটি সর্বদা আত্তিলিওর সঙ্গী, সেই সেই যন্ত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। ব্যারোমিটারের কাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি আসন্ন, খুব সম্ভব দু'চারদিনের মধ্যেই বর্ষণ শুরু হবে! কিন্তু আত্তিলিওর তো দুদিন পরে হলে চলবে না, এই মুহূর্তে বৃষ্টির দরকার—তবে?···

আত্তিলিও ঘড়ি দেখলেন। ঠিক এগারোটা বেজেছে। প্রায় এক ঘণ্টা হল ম্‌দাবুলি চলে গেছে এখান থেকে। সমবেত কণ্ঠে ঐকতান সঙ্গীত বেজে উঠেছে তীব্র শব্দে,দ্রুততর হয়ে উঠছে নৃত্যের ছন্দ—বর্শাগুলো কিন্তু এখনও ন্‌গোর দেহস্পর্শ করেনি। ন্‌গোর দিকে তাকালেন আত্তিলিও। একটুও বিচলিত হয়নি সে। তার সুশ্রী মুখমণ্ডলে গভীর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের চিহ্ন।······

আত্তিলিও চিন্তা করতে লাগলেন। একজন ইনডানা যেন একটু আগেই কি বলছিল······কি বলছিল?······হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে

পড়েছে—দু' ঘণ্টা পরেই দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এই এলাকায় পদার্পণ করছে সর্দার জিপোসো এবং এলাকার মধ্যে এসে পড়লে সর্বাধিনারক তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কতক্ষণ অজ্ঞ থাকবে বলা শক্ত—অতএব দু'ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিল উক্ত ইনডানা।

দু' ঘণ্টা ? এই দু' ঘণ্টা যদি জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন আত্তিলিও তাহলে বোধহয় ন্গোর প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু এই ক্ষিপ্ত জনতাকে কি অতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ?···আত্তিলিও দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন·····

একটা তীব্র চিৎকার আত্তিলিওর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

না, ন্গো নয়—চেঁচিয়ে উঠেছে জনতা ! রক্তপাত শুরু হয়েছে আঘাত মারাত্মক নয়, কিন্তু বর্শার আঘাতে ন্গোর বাম জানু থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত !

আর রক্ষা নেই—আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠবে তারপর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে একসময়ে নেমে আসবে মৃত্যু !

'দাঁড়াও ! থামো, চেঁচিয়ে উঠলেন আত্তিলিও। নাচ থেমে গেল। দারুণ বিস্ময়ে চমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যোদ্ধার দল।

আত্তিলিও বললেন, 'দাঁড়াও, জুলুরা, দাঁড়াও ! বর্ষার দেবতা আনজিয়ানা এখনই বৃষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

একশ' মানুষ মুখ তুলল আকাশের দিকে। পরক্ষণেই জাগল ক্রুদ্ধ গঞ্জনধ্বনি। কোথায় বৃষ্টি ? আসন্ন বৃষ্টিপাতের কোন চিহ্নই নেই নীল আকাশের বুকে। কারও দিকে চাইলেন না আত্তিলিও কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না তিনি, সোজা এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝখানে।

'একটু অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো।' যে ইনডানার সঙ্গে আত্তিলিওর বন্ধুত্ব ছিল, সেই লোকটি এবার এগিয়ে এল। জনতাকে উদ্দেশ করে সে যে আদেশ বাণী উচ্চারণ করল,

তার মর্মার্থ হচ্ছে ধৈর্যধারণ করে সাদা মানুষের 'ম্যাজিকের বাক্স' কি করে সেইটা দেখাই এখন জুলুদের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য।

আভিলিও ততক্ষণে তাঁর ম্যাজিকের বাক্স অর্থাৎ ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছে এবং অতি মন্থর পদে অগ্রসর হয়েছেন ন্‌গোর দিকে। ক্যামেরার লেনস ন্‌গোর দিকে। ক্যামেরার লেনস ন্‌গোর বুকের কাছে ধরে ধরে ফিস ফিস করে আভিলিও বললেন, 'চাঁাচাও।'

জোরেই চেঁচিয়েছিল ন্‌গো। এমন কর্ণভেদী মনুষ্যকণ্ঠের আর্তস্বর ইতিপূর্বে কখনও আভিলিওর শ্রুতিগোচর হয়নি।

"দেখেছ?" বিজয়গর্বে ঘুরে দাঁড়ালেন আভিলিও জনতার দিকে, 'একশ' বর্শার সামনে দাঁড়িয়ে সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে!—এখন বুঝেছ আমার ক্ষমতা?"

জুলুরা চমৎকৃত! সত্যি কি ভয়ংকর ঐ ম্যাজিকের বাক্স? আরও-ভয়ঙ্কর ঐ বাক্সের চোখটা (লেনস)?

এইবার এক লম্বা বক্তৃতা শুরু করলেন আভিলিও। অভিভূত জুলু জনতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই আজগুবি, অদ্ভুত আর অসম্ভব কথাগুলো শুনতে লাগল। যত রকমের বিদঘুটে অবিশ্বাস্য বিষয়বস্তু আভিলিও ভাবতে পেরেছিলেন, সবগুলোকেই তিনি পরিবেশন করেছিলেন সেই বক্তৃতার মধ্যে।

টোয়াবেনি আব সুকামবানা রাগে কাঁপছিল। তাদের দিকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন আভিলিও, 'কি হে! এইবার? তোমরা কি বলতে চাও?'

অনেক কিছুই হয়তো বলার ছিল। কিন্তু দুই শয়তান চুপ করে রইল। তারা জানতো জুলুরা এখন তাদের কোনও কথায় কর্ণপাত করবে না সাদা মানুষের ম্যাজিকের বাক্স, আর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা এখন তাদের অভিভূত করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আভিলিও আর এক কাজ করেছেন—পকেট থেকে সিগারেট বার করে বিলিয়ে দিয়েছেন জুলুদের মধ্যে। জুলুল্যাণ্ডে সিগারেট অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য

আর লোভনীয় বস্তু। অধিকাংশ লোকই সিগারেট নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল হত্যার আগ্রহে যারা একটু আগেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তারাই এখন ধোঁয়া ওড়াচ্ছে নির্বিকারভাবে।

আত্তিলিও জানতেন এই পরিবর্তন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আবার ক্ষেপে উঠবে জনতা। তবে কিছুটা সময় তো পাওয়া গেল। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আত্তিলিওর উর্বর মস্তিষ্কে জন্ম নিয়েছে এক নতুন পরিকল্পনা—'দেখেছ?' আত্তিলিও কম্পাস বার করে সকলের সামনে ধরলেন, 'এই ছাখো, ছোট্ট বর্শাটা (কম্পাসের কাঁটা) কেমন কাঁপছে! এর মানে কি জানো?'

জুলুরা মাথা নাড়ল—না, সাদা মানুষের ভেলকি তারা বুঝতে পারে না। 'এর মানে হচ্ছে,' আত্তিলিও বললেন, 'এখনই বৃষ্টি শুরু হবে। সামনের গাছটার ছায়া এই জায়গায় পড়লেই বৃষ্টি নামবে।'

আত্তিলিও তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠুকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

জনতা এখন আর হিংস্র নয়। তাদের অস্বাভাবিক উন্মাদনা কেটে গেছে। আত্তিলিও জুলুদের স্বভাব জানতেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন উপস্থিত জনতার মধ্যে অনেক মানুষই এখন সর্বাধিনায়ক জিপোসোর আইন ভঙ্গ করার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। আত্তিলিও হয়তো জনতার শুভবুদ্ধিকে আবার জাগিয়ে তুলে ন্‌গোকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু টোয়বেনি আর স্নুকামবানা তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। শান্ত জনতাকে আবার তারা উত্তেজিত করে তুলল।

……মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে… গাছের ছায়াটা সরে সরে এসে আত্তিলিওর চিহ্নিত স্থানের খুব কাছেই এসে পড়েছে।

চাপা গলায় গর্জে উঠল টোয়াবেনি, 'ছায়াটা ঠিক জায়গায় এসে

পড়লেই বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা। যদি তা না হয় তবে ন্‌গোকে হত্যা করা হবে।'

একটু থামল টোয়াবেনি, তার অবরুদ্ধ কণ্ঠ সাপের মতো হিস হিস করে উঠল, 'তারপর সাদা মানুষের পালা।'

আত্তিলিও জানতেন সেটা সহজ নয়। জুলুরা তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না। তবে টোয়াবিনি যে তাঁকে খুন করার চেষ্টা করবে সে বিষয়ে আত্তিলিওর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সময় কাটতে লাগল ধীরে ধীরে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল গাছের ছায়া নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত, আত্তিলিওর চিহ্নিত স্থানে উজ্জ্বল রোদের আলোকে লুপ্ত করে নামল অন্ধকারের প্রলেপ—

গাছের ছায়া এসে পড়েছে চিহ্নিত স্থানের উপর!

জুলুরা আকাশের দিকে মুখ তুলল—নির্মেঘ আকাশে জ্বলছে মধ্যাহ্ন সূর্য, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনাই সেখানে দেখা যাচ্ছে না!

জনতার মধ্যে আবার জাগল হিংস্র উত্তেজনা। আবার শুরু হল উদ্দাম নৃত্য। এবার তারা দেরী করতে চায় না,—কয়েকটা আসগাই (বর্শা) ন্‌গোর দেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করল। ক্ষতচিহ্নগুলো খুবই তুচ্ছ ছিল বটে, কিন্তু আত্তিলিও জানতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আঘাতের বেগ জোরালো হয়ে উঠবে—রক্ত দেখে ক্ষেপে উঠবে জুলুরা, সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক গভীর হয়ে চেপে বসতে থাকবে বর্শা-ফলকের দংশন এবং এক সময়ে চরম আঘাতে নেমে আসবে মৃত্যু।

আত্তিলিওর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। তিনি বুঝেছেন আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ন্‌গোর মৃত্যু অবধারিত। তারপর তাঁর পালা। টোয়াবেনির ইঙ্গিত পেলেই তারা যে আত্তিলিওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে বিষয়ে আত্তিলিও ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁর একমাত্র ভরসা সবাধিনায়ক জিপোসো। কিন্তু জিপোসোকে যে এখানে নিয়ে আসতে পারে, সেই ম্‌দাবুলি এখন কোথায়? চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান নরভুক্

সিংহদের নজর এড়িয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে জিপোসোর সঙ্গে দেখা করতে সমর্থ হয়েছে কি জুলুবালিকা?......

একটা বর্শার ফলা ন্‌গোর বুকে বিদ্ধ হল। হৃৎপিণ্ডের একটু উপরে। এগিয়ে এল আর একটা বর্শা। আত্তিলিও বুঝলেন চরম আঘাত পড়ার সময় এগিয়ে এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে ন্‌গো। আর তারপরই যে রক্তাক্ত বর্শাফলকগুলো নেচে উঠবে তাঁর চারপাশে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আত্তিলিও সেই দুরবস্থার কথা কল্পনা করে চমকে উঠলেন—ন্‌গোর মতো নির্বিকার মুখে অবিচলিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সাধ্য তাঁর নেই.....

আত্তিলিও নিজের শ্রবণ শক্তিকে বিশ্বাস করতে পারলেন না—ন্‌গোর নাম ধরে কে যেন ডাকছে!

কিন্তু না, ভুল হয় নি—উপত্যকার তলা থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল আবার, 'ন্‌গো! ন্‌গো!

আত্তিলিও দেখলেন পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে ছুটে আসছে ম্‌দাবুলি!

পাহাড়ের অপর প্রান্তে যেখানে আত্তিলিও সাহেব রাইফেল রেখে এসেছিলেন সেখানেও আবির্ভূত হয়েছে অনেকগুলো বর্শাধারী মনুষ্যমূর্তি! সর্দার জিপোসো এসে পড়েছে সসৈন্যে।

জনতা সচমকে ফিরে দাঁড়াল, তারপর প্রাণপণে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। কেউ পালাতে পারল না, জিপোসোর সৈন্যরা প্রত্যেকটি মানুষকেই বন্দী করে ফেলল।

ম্‌দাবুলি ছুটতে ছুটতে এসে আত্তিলিওর সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

আত্তিলিও বলে উঠলেন, 'ভয় নেই, ন্‌গো বেঁচে আছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিল ম্‌দাবুলি, 'তুমি—তুমিও বেঁচে আছো।'

ঠিক দুদিন পরেই বৃষ্টি নামল জুলুল্যাণ্ডে।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সর্বাধিনায়ক জিপোসো

আহত ন্‌গো আরোগ্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই জিপোসোর আস্তানাতে বিচারসভা বসল। বলাই বাহুল্য বিচারক ছিল জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো।

বিচারের ফলাফল দেখে আত্তিলিও বুঝলেন জুলুদের নেতা অসাধারণ—তার দূরদর্শিতা, রাজনীতিজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতুলনীয়।

ইনডানা বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা উঠল না। সর্বাধিনায়ক শুধু বলল, উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিহ্বা সম্বন্ধে সংযত হওয়া উচিত এবং যেহেতু তারা মূর্খের মতো কথা বলে এক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সেইজন্য কয়েক দিন সম্পূর্ণ মৌন থেকে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গন্ধের বিচারে যে যোদ্ধার দল অংশগ্রহণ করেছিল, তারা রেহাই পেল না। আদালতের রায় অনুসারে প্রত্যেক যোদ্ধার উপর জরিমানা ধার্য হল,—উত্তমরূপে প্রস্তুত একটি আসাগাই (বর্শা), তিনটি বাছুর ও তিনটি ছাগল। জন্তুগুলো যেমন-তেমন হলে চলবে না, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেরা জন্তুগুলোকেই দাবি করছে আদালত।

সাধারণ যোদ্ধাদের চার গুণ বেশী জরিমানা ধার্য হল সুকামবানার উপর। জরিমানার ফলে যে পশু-আদায় করা হল, সেই জন্তুগুলোর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ ন্‌গোকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হল। অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করল সর্দার জিপোসো, আদালতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য।

টোয়াবেনিকে নিজের হাতে শাস্তি দিল না জিপোসো। ঐ শয়তান যাদুকরের কুকীর্তির বিশদ বিবরণসহ তাকে প্রেরণ করা হল 'ইশোয়ি' নামক স্থানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। শ্বেতাঙ্গদের বিচারে টোয়াবেনির যে কি দুরবস্থা হবে সে বিষয়ে জিপোসো ছিল দস্তুর মতো সচেতন।

নিজের হাতে দণ্ডবিধান করে জুলুদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হতে চায়নি বলেই সাদা মানুষের হাতে টৌয়াবেনির দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল সর্দারে জিপোসা। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত এক রক্ষিবাহিনী টৌয়াবেনিকে নিয়ে রওনা হল উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটেয় উদ্দেশ্যে।

জুলুদের চিরাচরিত নিয়ম-অনুসারে পরিবারের কর্তা মারা গেলে বা অক্ষম হলে ঐ পরিবারের সব দায়িত্বই সর্দারকে বহন করতে হয়। টৌয়াবেনির পরিবারভুক্ত মানুষগুলোর জন্য খুব ভাল ব্যবস্থাই করেছিল জিপোসো।

তবে টৌয়াবেনির অন্যতম কন্যা ম্‌দাবুলি সম্বন্ধে আদালতের সিদ্ধান্ত জন্য পাঠকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক—কারণ, উল্লিখিত জুলুবালিকা হচ্ছে এই অরণ্য-নাটকের নায়িকা।

জিপোসো ম্‌দাবুলির সঙ্গে ন্‌গোর বিবাহের ব্যবস্থা করল। তবে টৌয়াবেনির পরিবর্তে যেহেতু এখন কন্যার অভিভাবকের স্থান নিয়েছে জিপোসো, তাই বরকে পূর্ব-প্রতিশ্রুত তিরিশটি গরু কন্যাপণ করতে হবে জিপোসোরই শ্রীহস্তে! বিচারের এই অংশটুকু শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায় রাজ্যের সর্বত্র কি ঘটেছে না ঘটেছে, সে বিষয়ে সর্বাধিনায়ক সর্বদাই অবহিত—না হলে ন্‌গোর কন্যাগণের প্রতিশ্রুতি জিপোসোর কর্ণগোচর হয় কি করে?······

আঙ্গিলিওর জুলু অনুচর জামানিকে নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে? জিপোসোর বিচারসভাতে জামানিকেও ডাকা হয়েছিল। সে আঙ্গিলিওকে সব ঘটনা খুলে বলেছিল বলেই একটা দুর্ঘটনায় গতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু জুলু জাতির অধিনায়কের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে খুব অন্যায় হয়না—বরং জাতীয়স্বার্থে সেটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য জিপোসো একবারও বলে নি যে, জামানি মূর্খের মতো জুলুজাতির গোপন তথ্য সাদা মানুষের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে, এবং যে-মানুষ বিদেশীর কাছে এতখানি বিশ্বস্ত হতে পারে, দেশের বাইরে

তার উপস্থিতি জাতির পক্ষে বিপজ্জনক। না, না, এসব কথা মোটেই বলেনি জিপোসো,—বরং জামানির প্রশংসায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। জিপোসো জানাল তার দেশের যে মানুষটি এমন অদ্ভুত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী তাকে সে হারাতে পারে না। জাতীয় স্বার্থে ঐ লোকটির সর্বদাই অবস্থান করা উচিত দেশের মধ্যে। অতএব সর্বাধিনায়কের নিজস্ব পরামর্শদাতার সম্মানজনক পদে জামানিকে বহাল করা হল এবং টোয়াবেনির ক্রাল-এর যাবতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগ করার অধিকার দেওয়া হল জামানিকেই।

জামানিকে শুধু ঘরই দেয়নি জিপোসো, ঘরণীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। দুটি জুলু যুবতীর সঙ্গে জামানির বিবাহের ব্যবস্থা করে দিল সর্বাধিনায়ক জিপোসো। দু'দুটো বৌ পেয়ে জামানি এত খুশী হল যে, কন্যাপণ হিসাবে জিপোসোকে এক কুড়ি গরু দিতেও আর আপত্তি হল না। আত্তিলিও বুঝলেন, জিপোসো সকলের প্রতি সুবিচার করল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের সম্পত্তির পরিমাণও বাড়িয়ে ফেলল সুকৌশলে!

সকলেরই যখন বিচার হল, তখন আত্তিলিওর দলবলই বা বাদ যায় কেন? জিপোসোর পরিবর্তে অন্য কোনও নেতা হলে সে স্পষ্টই বলতো, 'শোনো ভাই! তোমরা এখানে এসে সিংহ মেরেছে, দাঁতের ব্যথা সারিয়েছ। ভাল ভাল উপহারও দিয়েছ--সব সত্যি; কিন্তু আগে বলো তো ভাই, এখানে তোমাদের কে আসতে বলেছে? শুধু জুলুদের উপকার করে উদার-হৃদয়ের পরিচয় দিতেই তোমাদের শুভাগমন হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাস করার মতো মূর্খ আমরা নই। যা হয়ে গেল তার জন্য দেশের লোকের কাছে তোমরা খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠবে। জুলুরা তোমাদের ভয় করবে, এড়িয়ে চলবে—কারণ, যে কোন সময়ে তাদের গোপনীয় কথা তোমরা কর্তৃপক্ষের কাছে ফাঁস করে দিতে পারো। আর এখন তো জুলুল্যাণ্ডে বৃষ্টি নেমেছে, কাজেই তৃণভোজী পশুরা আবার এখানে ফিরে আসবে এবং সিংহের

দলও হামলা না করে বুনো জানোয়ারের দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব, তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চটপট বিদায় হও, জুলুরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিদেশীর নাক-গলানো পছন্দ করে না।'

হ্যাঁ, অন্য কোনও নেতার পক্ষে ঐ কথা বলাই স্বাভাবিক, কিন্তু জিপোসো হচ্ছে অসাধারণ মানুষ—অপ্রীতিকর ব্যক্তব্যকে সে উপস্থিত করতে পারে সুন্দরভাবে। অনর্থক তিক্ততাকে পরিহার করতে ভালভাবেই জানে সর্বাধিনায়ক জিপোসো।

অভিযাত্রীরা যে এখন পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করার কথা মুখেও আনেননি সেদিকে নজর না দিয়ে সমবেত জনতাকে জিপোসো জানিয়ে দিল, বিদেশী আগন্তুকরা জুলুদের জন্য যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করেছেন—অতএব তাঁরা দেশত্যাগ করার আগে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্তব্য। ন্‌গোকে হত্যা করার অনুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত জুলু যোদ্ধাদের আদেশ দেওয়া হল, তারা যেন প্রত্যেকেই গৃহনির্মিত কারুশিল্পের একটি করে নিদর্শন অভিযাত্রীদের উপহার দেয়—কারণ, পুর্বোক্ত একশ অভিযুক্ত যোদ্ধা আত্তিলিওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, অতএব উল্লিখিত উপহার জরিমানাস্বরূপ দিয়ে তারা বিদেশী অতিথির মার্জনালাভ করতে পারবে। এইটুকু শাস্তি যথেষ্ট বলে মনে করল না জিপোসো; সে জানাল অভিযাত্রীদের জিনিসপত্র সসম্মানে গাড়ীতে তুলে দিয়ে তাঁদের জুলুল্যাণ্ড পরিত্যাগ করার কাজে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ সাহায্যের ভার গ্রহণ করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করা চলবে না একথাও জানিয়ে দিতে ভুলল না জিপোসো।

এমন চমৎকার বিচারের ফলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ বা আনন্দের লক্ষণ দেখা গেল না। ম্রিয়মান জনতাকে লক্ষ্য করে জিপোসো গর্জন করে উঠল, 'তোমাদের জন্য যেন মাসাংগাদের যাত্রা করতে দেরী না হয়ে যায়। কাল সকালেই ওঁরা দেশ ছেড়ে চলে

যাবেন, তোমাদের ত্রুটির ফলে যদি যাত্রা করতে দেরী হয়, তবে জরিমানার পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। কথাটা যেন মনে থাকে।'

এইবার ভাষণ দিতে উঠলেন আত্তিলিও। খুব সহজ সরলভাবে নির্বিকার মুখে তিনি জানালেন, যে নেতা এমন সুন্দরভাবে বিচার করতে পারে এবং নির্বাক অতিথির মনোভাব বুঝতে পেরে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য চেষ্টিত হয়, তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা তাঁর জানা নেই—তবে এমন একজন অধিনায়কের নেতৃত্ব লাভ করে সমগ্র জুলুজাতি যে ধন্য হয়েছে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

পরের দিন সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন অভিযাত্রীরা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, যে লোকগুলো একদিন আগে বৃষ্টির জন্য নরহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তারাই আজ হাঁটু পর্যন্ত কাদাজলের ভিতর মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে বিব্রত! বৃষ্টিপাতের অবস্থা দেখে অভিযাত্রীরা বুঝলেন বৃষ্টি এখন সহজে থামছে না, অন্ততঃ বেশ কিছুদিন ধরে চলবে অনর্গল ধারা বর্ষণ। হঠাৎ জুলুল্যাণ্ড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অভিযাত্রীদের পূর্ব-পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আত্তিলিও সাহেব জিপোসোর কাছে প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করেননি। যাওয়ার আগে অশ্রুসজল চক্ষে অভিযাত্রীদেব বিদায় জানাল জামানি।

জুলুযোদ্ধারা খুব মনমরা হয়েই অভিযাত্রীদের মোট বহন করার কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল, ভাল ভাল হাতে-গড়া কারুশিল্পেও তারা অভিযাত্রীদের উপহার দিতে বাধ্য হয়েছিল জিপোসোর আদেশে— অতএব তাদের মুখে-চোখে যে খুব আনন্দের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে তাদের মুখে হাসি ফুটল—আত্তিলিও সাহেব উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠিত হন নি, এমন কি উপহারের বিনিময়েও অর্থ দিয়েছিলেন মুক্তহস্তে।

জুলুদের বিদায় করে অভিযাত্রীরা এইবার নিজেদের মধ্যে

আলোচনা-সভা ডাকলেন। হঠাৎ জুলুল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেওয়া তাঁদের কর্মসূচীর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল। আলোচনার ফলে স্থির হল, মোজাম্বিক এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভিতর দিয়ে ফিরে যাবেন বিল ও প্রফেসর। কোনও অজ্ঞাত কারণে হাতী শিকারের জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ করছিল বিল; কয়েকটা হাতীর ভবলীলা সাঙ্গ করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই।—অতএব ঠিক হল, বায়রা থেকে ইউরোপ হয়ে যাত্রা করার আগে সে কয়েকটা হাতী মারার চেষ্টা করবে। চলতি মাসের শেষদিকে কেপটাউনে গিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে আন্তিলিও দেখা করবেন বলে কথা হল।

তাঁরা স্থির করলেন কেপটাউন থেকে ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকাতে গিয়ে নূতন করে একটা অভিযান-বাহিনী সংগঠিত করবেন এবং আফ্রিকার যে-সব স্থান আজও অনাবিষ্কৃত সেখানে পূর্বোক্ত অভিযান-বাহিনীর সাহায্যে গবেষণার কাজ চালাবেন।

পরবর্তী অভিযানের জন্য যে জায়গাটাকে আন্তিলিও মনোনীত করেছিলেন, সেটি হল আফ্রিকার কিভু অরণ্য—অতিকায় দানব-গরিলার বাসস্থান।

অভিযাত্রীদের জল্পনা-কল্পনা শুনে অদৃশ্য নিয়তির ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটেছিল মনে হয়; কারণ—

বায়রা থেকে জাহাজ ধরতে পারে নি বিল, তার আগে সে নিজেই ধরা পড়ে গেল এক স্বর্ণকেশী সুন্দরীর হাতে। কিন্তু তারপরই নববধূর সান্নিধ্য ত্যাগ করে বিল ছুটে গেল এক সাংঘাতিক ভবিতব্যের দিকে—

এইবার প্রফেসরের কথা। কেপ-টাউনে বন্ধুবর আন্তিলিওর সঙ্গে দেখা করার পরিবর্তে তিনি ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন এবং আমাদের কাহিনী থেকেও বিদায় গ্রহণ করলেন এখান থেকেই—আন্তিলিও গত্তির অন্যান্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মধ্যে আমরা আর প্রফেসরকে দেখতে পাব না······

এদিকে কাহিনীর নায়ক আন্তিলিও কিভুর জঙ্গলে দানব-গরিলার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু গরিলার পরিবর্তে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল দলবদ্ধ এক জান্তব বিভীষিকা!

সেই চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে আন্তিলিওর পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

সৈনিকের তৃতীয় অভিজ্ঞতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আত্তিলিওর সঙ্গী

বর্তমান কাহিনীতে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার আগে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি বলেছেন, এই ঘটনা যদিও বহুদিন আগে ঘটেছে, তবু এখনও 'মহিষ' শব্দটি যদি তিনি শোনেন অথবা উক্ত পশু সম্বন্ধে কোনও আলোচনা যদি তাঁর শ্রুতি গোচর হয়, তাহলে তাঁর সর্বাঙ্গের মাংস-পেশী হয়ে যায় আড়ষ্ট—এখনও পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে তিনি যেন শুনতে পান শত শত খুরের ভয়াবহ ধ্বনি, এখনও তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যেখানে প্রান্তরের উপর দণ্ডায়মান তাঁর অসহায় দেহ লক্ষ করে ছুটে আসছে শত শত জীবন্ত বিভীষিকা সম্মুখে অবস্থিত মনুষ্য মূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্য···

এই ভীতিপ্রদ কাহিনী পরিবেষণ করার আগে আফ্রিকার বুকে আত্তিলিওর প্রথম অভিজ্ঞতার বিবরণী পাঠকের দৃষ্টি-গোচর হওয়া দরকার—ঐ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ করলেও পাঠক বুঝতে পারবেন আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে কেবল 'মহিষ' নামক জীবটি সম্বন্ধে আত্তিলিওর বিদ্বেষ মূলক মনোভাব নিতান্ত অকারণে সৃষ্ট হয়নি। কম্যাণ্ডার সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, আফ্রিকাবাসী যাবতীয় মহিষকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে শত্রু বলে মনে করেন। আফ্রিকার অরণ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহিষ সম্বন্ধে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আত্তিলিও। যে শোচনীয় ঘটনার ফলে পূর্বোক্ত শৃঙ্গধারী পশুটি সম্পর্কে আত্তিলিওর মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই ঘটনার বিশদ বিবরণীর মধ্যে বর্তমান কাহিনীর শুরু।

আত্তিলিও গত্তির বয়স যখন কুড়ির কিছু বেশী, সেই সময়ে শিকার-কাহিনী, অভিযান-কাহিনী ও জীবজন্তু বিষয়ক প্রচুর পুস্তক পাঠ করে তাঁর ধারণা হল ঐসব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে—এইবার একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেই হয়। তিনি মনে করলেন কয়েকটা ঘোড়া, রাইফেল আর গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে পারলেই আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে অভিযান শুরু করা যায়। অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান সুদানের অজ্ঞাত স্থানগুলোকেই অভিযানের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন আত্তিলিও সাহেব। পরে অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন পুঁথিগত বিদ্যা আর বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য এক নয়।

একে অল্প বয়সের গরম রক্ত, তার উপর বিস্তর বই-টই পড়ে আত্তিলিও হয়ে পড়েছেন সবজান্তা—অতএব সকলের মতামত অগ্রাহ্য করে তিনি উপস্থিত হলেন সুদানের খার্তুম নামক স্থানে। শুধু গন্তব্যস্থল সম্পর্কে পরিচিত মানুষের মতামত উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি আত্তিলিও, সকলের সাবধানবাণী তুচ্ছ করে তিনি মেলা-মেশা শুরু করলেন মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। আত্তিলিওর শুভার্থীরা তাঁকে একবাক্যে ঐ বিপজ্জনক লোকটির সংস্রবে আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু সবজান্তা আত্তিলিও কারও কথায় কান দিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল মহম্মদ আলি এবং আত্তিলিও গত্তির সম্পর্ক হচ্ছে কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতোই অবিচ্ছিন্ন।

খার্তুমের মানুষ মহম্মদ আলিকে ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদী বলেই মনে করতো। তাদের ধারণা হচ্ছে উক্ত ব্যক্তি খার্তুম ছেড়ে কোথাও যায় নি, এবং সুদানের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে যদি কেউ তার কাছে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করতে যায় তবে সেই নির্বোধ তিব্বতের লামার বিষয়েও মহম্মদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে—কারণ, মহম্মদ আলির কাছে সুদানের বন্যপ্রাণী আর তিব্বতের লামা দুই-ই সমান। দুটি বিষয়েই সে সমান অজ্ঞ।

মহম্মদের মুখে যেসব ভয়ানক ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব ঘটনা যে প্রত্যক্ষ্য-দর্শীর বিবরণ না হয়ে ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদীর মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনাশক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে এমন কথা আত্তিলিওর মনে আসে নি—মহম্মদ সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত ঈর্ষাকাতর মানুষের নিন্দা বলেই মনে করেছিলেন আত্তিলিও। সুতরাং আত্তিলিওর বিচারে শিকার অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে বিবেচিত হল যে ব্যক্তি, তার নাম—মহম্মদ আলি।

সমগ্র খার্তুমের মানুষ একদিন বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে দেখল, আত্তিলিও সাহেব মহম্মদ আলিকে তাঁর পথপ্রদর্শকের কার্যে নিযুক্ত করেছেন। আত্তিলিও পরে জানতে পেরেছিলেন, কথার জাল বুনে চতুর মহম্মদ তাঁকে যে পারিশ্রমিক অর্থ দিতে রাজী করিয়েছিল, সেই টাকার অঙ্কটা ছিল যথেষ্টর চাইতেও বেশী। অবশ্য মহম্মদের পক্ষে পারিশ্রমিক অর্থ শেষ পর্যন্ত হস্তগত করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহম্মদ আলির মৃত্যু

ছয়জন স্থানীয় অধিবাসী নিয়ে গঠিত ছোট দলটিকে নিয়ে ফাংপ্রভিন্স নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন আত্তিলিও। তিনি এবং মহম্মদ আলি ঘোড়ায় চড়ে দলের আগে আগে চলছিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে এসে এক ব্যক্তির মুখে আত্তিলিও শুনলেন ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে আশ্চর্য দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে আটশ মহিষের একটি বিরাট দল। এমন প্রকাণ্ড দল বড় একটা দেখা যায় না। পূর্বোক্ত মহিষযূথকে স্বচক্ষে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে মাত্র কয়েকটি লোক। তারা সকলেই জানিয়েছে এমন চমকপ্রদ ও ভয়াবহ দৃশ্য কখনও তাদের চোখে পড়েনি। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন আত্তিলিও—শত শত অতিকায় মহিষ প্রায় এক মাইল

স্থান ধরে সারিবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করেই তাঁর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! তিনি ঠিক করলেন যেভাবেই হোক মহিষ-যূথকে তিনি একবার স্বচক্ষে দেখবেন।

তাঁবুতে ফিরে তিনি জানিয়ে দিলেন উল্লেখিত মহিষযূথের উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই যাত্রা করবেন বলে, এবং ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোনও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত।

আন্তিলিওর ঘোষণা শেষ হতে না হতেই মোটবাহক, রাঁধুনি, ছোকরা-চাকর প্রভৃতি যে ছয়জন লোক দলে ছিল তারা সকলেই প্রাণপণে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে তাদের বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারলেন না আন্তিলিও! তিনি স্বয়ং এইবার চাচাঁতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ তারস্বরে চেঁচিয়ে আন্তিলিও দলের মধ্যে স্তব্ধতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। তারপর তিনি মহম্মদ আলিকে ডেকে দলের লোকদের এমন অসঙ্গত আচরণের কারণ জানতে চাইলেন।

মহম্মদ আন্তিলিওকে জানাল তাঁর পরিকল্পনা শুনে উৎসাহিত হয়েই দলের মানুষ হঠাৎ কোলাহল করে উঠেছিল, অতএব ঐ নিয়ে আন্তিলিওর আর চিন্তা করা উচিত নয়।

না, আন্তিলিও আর চিন্তা করেননি,—পরের দিন যখন তাঁরা রওনা হলেন, তখনও দলের লোকদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নিয়ে মাথা ঘামাননি আন্তিলিও—কিন্তু তিন দিন পরে এক মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে উঠেই যখন তিনি আবিষ্কার করলেন মহম্মদ ছাড়া প্রত্যেকটি লোকই হঠাৎ তাঁবু থেকে অদৃশ্য হয়েছে, তখনই কয়েকদিন আগের কণ্ঠস্বরের তীব্র প্রতিযোগিতার কথা তাঁর মনে হল এবং মহম্মদ আলি যে দলের লোকের উৎকণ্ঠার বিপরীত ব্যাখ্যা করে মনিবকে ধোঁকা দিয়েছে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ রইল না একটুও।

মহম্মদকে ডাকলেন আন্তিলিও। দলের যাবতীয় মানুষ তাঁবু ছেড়ে উধাও হয়েছে এই খবরে যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল

মহম্মদ আলি। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া সাজিয়ে সে জানাল, সবচেয়ে বড় মহিষের মাথাটা আস্তিলিওকে যোগাড় করে দেবে বলে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সে দৃঢ়সংকল্প—হতচ্ছড়া পলাতকদের সে বুঝিয়ে দেবে মহম্মদ আলি কোন্ ধরনের মানুষ, কারও সাহায্য ছাড়াই মহিষযূথের সংবাদ সে সংগ্রহ করবে এবং ঐ খবরের জন্য এক মুহূর্ত দেরি না করে সে যাত্রা করতে প্রস্তুত।

বলতে বলতেই সে তড়াক করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, আর হতভম্ব আস্তিলিওকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে!

হঠাৎ আস্তিলিওর মনে হল মহম্মদ আলিও বোধহয় অন্যান্য অনুচরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উদ্যত হয়েছে! নিখুঁত পদ্ধতিতে ফাঁকি দেওয়ার এইটাই বোধহয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক কায়দা! আস্তিলিও সাহেবের সন্দেহ সত্য, না, অন্যায়ভাবে মহম্মদের বীরত্ব ও সদিচ্ছার প্রতি সন্দিহান হয়ে তিনি উক্ত আরব দেশীয় মানুষটির প্রতি অবিচার করেছিলেন—সে কথা কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার স্রোত একটা প্রহসনমূলক নাটকের সূচনা করছিল—আচম্বিতে ঘটনাচক্রের দ্রুত পরিবর্তন সেই প্রহসনকে রূপান্তরিত করল এক বিয়োগান্ত নাটকের রক্তাক্ত দৃশ্যে!

এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের জন্য দায়ী হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড বন্য মহিষ। যে দলটাকে আস্তিলিও অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, এই জন্তুটা সেই দলভুক্ত নয়—একটা দলছাড়া মহিষের একক উপস্থিতি সমস্ত ঘটনাস্রোতকে বদলে দিয়েছিল।

মহম্মদ তখনও ঘোড়ার পিঠে দৃশ্যমান, আস্তিলিও প্রাণপণে চেঁচিয়ে তাকে ফিরে আসতে বলছেন—হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে আস্তিলিওর থেকে প্রায় তিনশ ফিট দূরে আবির্ভূত হল এক কৃষ্ণকায়

বিপুলবপু বন্য মহিষ! জন্তুটা ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল মহম্মদ আলির বাহন আরবী ঘোড়াটার দিকে!

'সাবধান! চেয়ে ছাখো—সামনে বিপদ!' চেঁচিয়ে মহম্মদকে সাবধান করে দিলেন আন্তিলিও, পরক্ষণেই ছুটলেন তাঁবুর ভিতর থেকে রাইফেল হস্তগত করার জন্য।

মুহূর্তে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন আন্তিলিও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে—প্রচণ্ড সংঘর্ষে মিলিত হল মহিষ ও ঘোটক! আন্তিলিও দেখলেন মহিষের শিং ঘোড়ার বুকের ভিতরে ঢুকে গেছে! পরক্ষণেই ঘোড়াটাকে শিং বিঁধিয়ে শূন্যে তুলে ফেলেছে মহিষ এবং দারুণ যাতনায় মহিষের মাথার উপর ঘোড়া ছটপট করছে!

মহম্মদ আলি ছিটকে পড়েছিল কয়েক গজ দূরে। ছুটে পালানোর জন্য সে তাড়াতাড়ি ভূমিশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল—কিন্তু সে উঠে দাঁড়ানোর আগেই মহিষ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল! ঘোড়াটা তখনও মহিষের মাথার উপর শৃঙ্গাঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় ছটফট করছিল, কিন্তু ঘোটকের দেহভার মহিষাসুরের গতিরোধ করতে পারল না—সে এসে পড়ল ভূপতিত মহম্মদ আলির দেহের উপর!

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন আন্তিলিও; অভ্যস্ত আঙুলের স্পর্শে রাইফেলের বুলেট মহিষের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। আন্তিলিও দৌড়ে এলেন আবদ্ধ জন্তু দুটির দিকে। ঘোড়াটা অসহ্য যাতনায় ছটফট করছিল। আন্তিলিওর রাইফেল তার মৃত্যুকে সহজ করে দিল। মহিষের দেহে প্রাণ ছিল না, গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

মহম্মদের অবস্থা খুবই শোচনীয়—মহিষ আর ঘোড়া জড়াজড়ি করে তার উপরই পড়েছে, দুটি বিশাল দেহের নীচে পিষ্ট হয়ে সে এখন মৃত্যুপথের যাত্রী। শিং দুটো মস্ত বড়, প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল মহম্মদ, 'যেমন··যেমন···আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম'··· তার কণ্ঠরুদ্ধ হল, কালো গোঁফ দুটির নীচে রক্তমাখা দাড়ির ভিতর

থেকে যে হাসিটি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসির রেখা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মৃত্যুর স্পর্শে—হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করল মহম্মদ আলি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মহিষ

পূর্বোক্ত ঘটনার পর থেকেই মহিষ সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ পোষণ করতেন আত্তিলিও গতি।

একাধিক পুস্তকে মহিষ-বিষয়ক তথ্য পাঠ করে আত্তিলিও জেনেছিলেন ঐ জন্তুটি আক্রান্ত না হলে অথবা প্ররোচিত না হলে বিনা কারণে কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মহম্মদ আলি ও তার বাহন আরবী ঘোড়াটার মৃত্যু দেখে আত্তিলিও বুঝেছিলেন কেতাবে লিখিত তথ্য আংশিক সত্য হলেও হতে পারে, সর্বাংশে সত্য কখনই নয়। এইখানে আফ্রিকার মহিষ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার মহিষগোষ্ঠীর কোনও জন্তুকেই নিরীহ বলা চলে না, মহিষ মাত্রেই ভয়ঙ্কর জীব।

গৃহপালিত মহিষও উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রাণ হরণ করেছে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়। মহিষগোষ্ঠীর বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জীব আফ্রিকার 'কেপ বাফেলো'। লেপার্ড, হায়না প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার কখনও কেপ বাফেলোর ধারে কাছে আসে না। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও পূর্ণবয়স্ক কেপ বাফেলোর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনিচ্ছুক—ক্রোধে আত্মহারা না হলে সিংহ কখনই মহিষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয় না। রুদ্রমূর্তি মহিষকে দেখে সিংহ চম্পট দিয়েছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়।

মহিষ পরিবারের সকল পশুরই প্রধান অস্ত্র শিং আর খুর। কেপ বাফেলো নামক আফ্রিকার অতিকায় মহিষও ঐ দুটি মহাস্ত্রে বঞ্চিত নয়; উপরন্তু তার মাথার উপর থাকে পুরু হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ—শিরস্ত্রাণের মতো মাথার উপরে দৃশ্যমান ঐ কঠিন অস্থি-আবরণ ভেদ

করে শ্বাপদের নখদন্ত কিংবা রাইফেলের বুলেট মহিষের মস্তিষ্কে আঘাত হানতে পারে না। ঐ অস্থি-আবরণের ইংরেজি নাম 'বস্ অব দি হর্নস ; সংক্ষেপে বস্'। বস্-এর দুদিকে অবস্থিত শিং-এর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪৫ ইঞ্চি। তবে ৫৬½ ইঞ্চি লম্বা শিংও দেখা গেছে। পূর্বোক্ত মহিষের আয়ু তিরিশ বছর, কিংবা আর একটু বেশী। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বলশালী তরুণ মহিষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক সময় প্রাচীন মহিষরা দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দলছাড়া মহিষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে এবং সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করে। নিঃসঙ্গ পুরুষ মহিষই সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার। মহম্মদকে হত্যা করেছিল ঐ রকম একটি নিঃসঙ্গ ভয়ঙ্কর গুণ্ডা মহিষ।

আফ্রিকাবাসী মহিষদের মধ্যে 'কেপ-বাফেলো' নামক জন্তুটি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে, কিন্তু আরও দুই জাতের মহিষ আফ্রিকাতে দেখা যায়। 'গ্যামা' নামে একরকম মহিষজাতীয় জানোয়ার আরব দেশে চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আছে 'বনগরু' বা 'পিগমি বাফেলো'। কেপ বাফেলো কাঁধ মাটি থেকে পাঁচ ফুট কিংবা আর-একটু বেশী উঁচু হয়, কিন্তু পিগমি বাফেলোর কাঁধের উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র তিন ফুট ; তার শিং ধারালো তবে ছোট এবং দেহের রং তার অতিকায় জ্ঞাতি-ভাইয়ের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়—রক্তাভ-পীত বর্ণে রঞ্জিত ঘন রোমশ দেহ নিয়ে একা অথবা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে ঐ খর্বকায় মহিষ। কেপ-বাফেলোর মতো দলবদ্ধ হয়ে পিগমি বাফেলো বা বনগরু কখনও বাস করে না।

আকারে ছোট হলেও ঐ মহিষগুলো যে কতখানি শক্তি সাহস ও ক্ষিপ্রতার অধিকারী হয়, নিম্নলিখিত ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

বেলজিয়ান কঙ্গোর জঙ্গলে আত্তিলিও সাহেব একবার একটা

'ওকাপি'কে জ্যান্ত অবস্থায় ধরার চেষ্টা করেন। 'ওকাপি' হচ্ছে নিরামিষভোজী দুষ্প্রাপ্য পশু। একটা ওকাপিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন আত্তিলিও—হঠাৎ একদিন সৌভাগ্যক্রমে 'মাম্বুটি' পিগমি জাতির নিগ্রো পথপ্রদর্শকরা একটা ওকাপিকে ঘেরাও করে ফেলল। ওকাপির পদচিহ্নের বনগরু বা খর্বকায় মহিষের টাটকা পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন আত্তিলিও। কিন্তু ওকাপির জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন বলে তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনি পিগমিদের কাছে খর্বকায় মহিষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেননি।

খুব মনোযোগের সঙ্গে ওকাপিকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলল। একটা বৃহৎ বৃত্তের আকার নিয়ে গোল হয়ে অবস্থান করছিল সবাই, মাঝখানে ওকাপিকে লক্ষ্য করে সেই চলন্ত মনুষ্যবৃত্তের পরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগল···আচম্বিতে সবুজ উদ্ভিদের জাল ভেদ করে দুটি রক্তাভ বিদ্যুৎ ঝলকের প্রচণ্ড আবির্ভাব! কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই দারুণ সংঘাতে ওকাপি-শিকারীরা চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে লাগল, আত্তিলিওর মাথা থেকে উড়ে গেল হেলমেট আর হাত থেকে বেরিয়ে গেল রাইফেল—এক মুহূর্তের জন্য আত্তিলিও অনুভব করলেন তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে গেছে মাটি এবং দেহ হয়েছে শূন্যপথে উড্ডীয়মান—পরক্ষণেই মৃত্তিকার কঠিন স্পর্শ আর চোখের সামনে সর্ষেফুল!

হৈ হৈ, চিৎকার, ধুন্ধুমার—যাচ্ছেতাই ব্যাপার!

দুটো বেঁটে বেঁটে মহিষ ধাঁ করে মানুষের ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অন্তর্ধান করল। সেই সঙ্গে পালিয়ে গেল আত্তিলিও সাহেবের এত সাধের ওকাপি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূল্যবান উপদেশ

খর্বকায় বামন মহিষের ধাক্কা খেয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার কয়েকদিন পরেই এক ইংরেজ-শিকারীর সঙ্গে হঠাৎ আত্তিলিওর আলাপ হয়ে

গেল। ঐ ইংরেজ শিকারীটি সারা জীবন ধরে আফ্রিকাতে বন্য মহিষের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে, বহু মহিষ শিকার করেছে এবং তার ফলে মহিষ-চরিত্র সম্বন্ধে সে হয়ে উঠেছে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ 'ইরামা' নামক স্থানে একটি দোকান থেকে শ্বেতাঙ্গরা জিনিসপত্র কিনতেন---আমাদের আক্তিলিও সাহেবও একদিন ঐ দোকানে উপস্থিত হলেন কয়েকটা প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করার জন্য। পূর্বে উল্লিখিত ইংরেজ-শিকারীও একই উদ্দেশ্যে সেই সময়ে দোকানে উপস্থিত হয়েছিল।

ছোট 'বুশ ব্লাউজ' ও 'সর্ট' পরিহিত আক্তিলিওর অনাবৃত বাহু ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে আঘাতজনিত কালশিরার চিহ্ন দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল দোকানদার। তাকে সংক্ষেপে ওকাপি ও খর্বকায় মহিষ-ঘটিত দুর্ঘটনার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করে দিলেন আক্তিলিও, তারপর টিনে বন্ধ শুষ্ক আনাজ ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু 'মহিষ' শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র আগন্তুক ইংরেজ আক্তিলিওর দিকে ছুটে এল।

লোকটির কথাবার্তায় তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চিহ্ন দেখে আক্তিলিও বুঝলেন সে তাঁকে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর শিকারী মনে করেছে। তিনি গরম হয়ে উঠলেন এবং শিকারী-জীবনের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, 'আক্তিলিও গত্তি নিতান্ত সাধারণ মানুষ নয়।' লোকটি তখন তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আবিস্কৃত তথ্য নিয়ে কথা কইতে শুরু করল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে আক্তিলিও যখন তার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন মূল্যবান সময়ের অপচয় হওয়ার জন্য তিনি মনে মনে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আক্তিলিও উপলব্ধি করেছিলেন ইরামার এক অখ্যাত দোকানে দাঁড়িয়ে অজ্ঞাতনামা এক ইংরেজ-শিকারীর কাছ থেকে মহিষ-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ

করেছিলেন বলেই তিনি সময়কালে কর্তব্য স্থির করে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মহিষ-প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল ঐ ইংরেজ শিকারী। সুদীর্ঘ শিকারী-জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সে জানতে পেরেছিল আক্রমণ-উদ্যত ক্ষিপ্ত মহিষকে বাধা দিতে পারে প্রশস্ত নদী, আগুনের জ্বলন্ত প্রতিবন্ধক এবং—

এবং মানুষের মৃতদেহ!

কথাটা শুনতে খুবই অদ্ভুত বটে, ইংরেজ শিকারী দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল, মৃতদেহের উপর মহিষ কখনও আক্রমণ চালায় না—সে মৃতদেহ লক্ষ্য করে ছুটে আসবে, কিন্তু সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে—কিছুতেই মরা মানুষকে স্পর্শ করবে না। দূরে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার তেড়ে এসে থমকে দাঁড়াবে,—এমনি করে বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার পর এক সময়ে প্রস্থান করবে মহিষ। আত্তিলিওর হঠাৎ-পাওয়া নতুন বন্ধু বলেছিল, 'যে মুহূর্তে মহিষ দেখবে মানুষটা নড়াচড়া না করে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, সেই মুহূর্তেই সে ধরে নেবে ওটা মৃতদেহ আর তৎক্ষণাৎ সে থেমে যাবে।'

'কিন্তু', আত্তিলিও প্রতিবাদ করেছিলেন, 'মহিষ দেখবে কেমন করে? অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি যে-সব জানোয়ার শিং দিয়ে আঘাত করে, তারা তো চোখ বন্ধ করে আঘাত হানতে অভ্যস্ত।'

'বাঃ! বেশ বলেছ!' বিজয়গর্বে হুঙ্কার দিয়ে উঠল ইংরেজ-শিকারী, 'এতদিন আফ্রিকাতে থেকে তুমি এই কথা বললে? তাহলে কি জানলে ঘোড়ার ডিম! মহিষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা উঁচু রেখে শত্রুকে লক্ষ্য করে—এই বৈশিষ্ট্যের কথা কি তোমার কিছুই জানা নেই?'

তাই তো! ঠিক কথা! এইবার আত্তিলিওর মনে পড়ল তার সঙ্গীর মৃত্যুকালীন ঘটনা—ঘোড়াটাকে শিং দিয়ে আঘাত করার

আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ মাথা উঁচু রেখেছিল, সামনে এসে একবারই সে মাথা নামিয়েছিল চরম আঘাত করার জন্য।

'বাঃ। বেশ বলেছ!' সুযোগ পেয়ে আবার বিদ্রুপ করল ইংরেজ শিকারী, 'আঘাত করার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ তার মাথা উঁচু করে রাখে, কারণ ঐ জন্তুটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের শয়তান। সে জানে মাথা নীচু করলে খুলির উপর বসানো পাথরের মতো শক্ত হাড়ের 'বস্' তার মস্তিষ্ক ও কপালকে শত্রুর আক্রমণ থেকে সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে, তবু সে মাথা উঁচু করে রাখে। কেন জানো? কারণ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ তার শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে অব্যর্থ সন্ধানে আঘাত হানতে চায়। আর সেইজন্যই সে মাথা তুলে শত্রুকে দেখতে থাকে, অন্যান্য শিংয়ালা জন্তুর মতো চোখ মুদে আক্রমণ করে না। মহিষের সামনে যদি কখনও যাও, তবে এই কথাগুলো মনে রাখবে, কখনও ভুলবে না।'

ইংরেজ-শিকারীর উপদেশ আস্তিলিওর মনে গেঁথে বসে গিয়েছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় অকস্মাৎ অবচেতন মনের গহন অন্তস্তল থেকে ঐ কথাগুলো ভেসে এসেছিল তাঁর স্মৃতির দরজায় এবং সেই জন্যই নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন আস্তিলিও সাহেব।

কিন্তু যে আধ-পাগলা ইংরেজ সারাজীবন ধরে মহিষ-চরিত্র নিয়ে গবেষণা করে ঐ জন্তু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছিল, সেই মানুষটা তার নিজের কথাগুলোই একদিন ভুলে গেল। একবারই ভুল করেছিল ইংরেজ শিকারী, কিন্তু ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ সে আর পায়নি। আস্তিলিওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কয়েক মাস পরেই একটি আহত মহিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইংরেজ-শিকারী প্রাণ হারিয়েছিল।

উক্ত ইংরেজ যেখানে মারা যায়, সেই জায়গাটা হচ্ছে 'আ্যাংকোলে' নামক নিগ্রো জাতির বাসস্থান। ইংরেজ-শিকারীর আরও একটি কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন আস্তিলিও। ঐ অঞ্চলেই এবং

সেই প্রমাণটা যে উপস্থিত করেছিল সে শ্বেতাঙ্গ নয়—জনৈক কৃষ্ণকায় অ্যাংকোলে-শিকারী।

মানুষ যে ঠাণ্ডা মাথায় কতখানি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, স্নায়ুর উপর তার সংযম যে কত প্রবল হতে পারে, তা দেখেছিলেন আত্তিলিও—ধনুর্বাণধারী এক অ্যাংকোলে শিকারীর বীরত্ব তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রাণ নিয়ে খেলা

বেলজিয়ান কঙ্গোর যে অঞ্চলে অ্যাংকোলে জাতি বাস করে, সেই জায়গাটা প্রধানত বন্য মহিষের বাসভূমি। বামন মহিষ নয়, অতিকায় মহিষাসুর কেপ-বাফেলোর ভয়াবহ উপস্থিতি অরণ্যকে করে তুলেছে বিপজ্জনক। অ্যাংকোলে নিগ্রোদের ভাষায় পূর্বোক্ত অতিকায় মহিষের নাম 'জোবি'। স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ অ্যাংকোলে জাতির নিগ্রোরা খুব লম্বা-চওড়া নয়—বেঁটে-খাটো, রোগা ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এই মানুষগুলোকে দেখলে অপিরিচিত বিদেশীর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যে, প্রয়োজন হলে ঐ ছোটখাটো মানুষগুলো কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারে। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে নিগ্রোরা ফাঁদ পেতে অথবা মহিষের চলার পথে গর্ত খুঁড়ে মহিষ-শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু অ্যাংকোলে-শিকারী অমন নিরাপদ পন্থায় শিকারকে ঘায়েল করার পক্ষপাতী নয়। কোন্ বিস্মৃত যুগে অ্যাংকোলে জাতির এক পূর্বপুরুষ আবিষ্কার করেছিল মহিষ-চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য—মরা মানুষকে মহিষ আঘাত করে না! তারপর থেকেই যুগ-যুগান্তর ধরে অ্যাংকোলে-শিকারীরা যে পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে থাকে, সেই বিপজ্জনক পদ্ধতির অনুসরণ করার সাহস অন্য কোনও জাতিরই নেই। আত্তিলিও সাহেব একবার অ্যাংকোলে জাতির মহিষ-শিকারের কায়দা

দেখেছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখার পর আন্ত্রিলিও বলেছিলেন সাদা কিংবা কালো চামড়ার অন্য কোনও জাতির শিকারী ঐভাবে অপঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে সাহস করবে না। তাঁর নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আন্ত্রিলিও জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর সেরা লক্ষ্যভেদী শিকারী যদি কাছেই রাইফেল বাগিয়ে বসে থাকে, তাহলেও অ্যাংকোলে-জাতির পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করতে তিনি রাজী নন।

ঘটনাটা এইবার বলছি।

একটি ছোট-খাটো চেহারার অ্যাংকোলে-নিগ্রো আন্ত্রিলিওকে তাদের মহিষ-শিকারের পদ্ধতি দেখাতে রাজী হয়েছিল। অবশ্য লোকটি আগে আন্ত্রিলিওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে, কোনও কারণেই তিনি উক্ত শিকারীকে বাধা দিতে পারবেন না এবং শোচনীয় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখলেও গুলি চালাতে পারবেন না। একটা উঁচু গাছের উপর আন্ত্রিলিও যখন বসলেন, তখনই অ্যাংকোলে-শিকারী তার কর্তব্যে মনোনিবেশ করল।

মুক্ত প্রান্তরের উপর এখানে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ছোট ছোট হলুদ রঙের ঘাসঝোপ। ঐরকম একটি ঘাসঝোপের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি। অস্ত্রের মধ্যে তার সঙ্গে ছিল তীর-ধনুক আর একটা ছোট ছুরি।

গাছের উপর থেকে খুব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে আন্ত্রিলিও আবিষ্কার করলেন দূর প্রান্তরের সীমানায় যেখানে এক সারি সবুজ ঘাস আত্মপ্রকাশ করেছে সেইখানে বিচরণ করছে অনেকগুলো কৃষ্ণকায় চতুষ্পদ মূর্তি—মহিষ!

প্রান্তরের বুকে তৃণভোজনে ব্যস্ত মহিষযূথের পিছনে বাঁদিকে অবস্থান করছে এক ভীষণ দর্শন পুরুষ মহিষ। আন্ত্রিলিও বুঝলেন ঐ জন্তুটাই হচ্ছে দলের প্রহরী এবং অ্যাংকোলে-শিকারীর লক্ষ্যস্থল 'জোবি'—ওকেই হত্যা করার চেষ্টা করছে ছোটখাট মানুষটি!

গাছের উপর থেকে আন্তিলিও দেখলেন ঘাসঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ মহিষের খুব কাছেই আবির্ভূত হল একটি মনুষ্যমূর্তি।

লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, গাছের উপর থেকে তার শরীরটা আন্তিলিওর দৃষ্টিগোচর হলেও মাটিতে দাঁড়িয়ে মহিষের পক্ষে লোকটিকে দেখা সম্ভব ছিল না। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে চটপট ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। ধনুকের টংকার-শব্দ আন্তিলিওর কানে এল। সঙ্গেসঙ্গে একটা সংঘাতের আওয়াজ এবং জান্তব কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি—মহিষের স্কন্ধে বিদ্ধ হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা তীর।

'সর্বনাশ', আন্তিলিও মনে মনে বললেন, 'এইবার তীর-বিদ্ধ মহিষ নিশ্চয়ই হাঁক দিয়ে দলকে সংকেত জানাবে। সেই শব্দ শোনামাত্র মহিষের দলটা ছুটে আসবে অ্যাংকোলা-শিকারীর দিকে।

সেরকম কিছু হল না। আহত মহিষ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল, বিরক্তভাবে দু একবার মাথা নাড়ল, মনে হল একটা বিরক্তিকর মাছিকে সে তাড়াতে চেষ্টা করছে—তারপর চারদিকে সঞ্চালিত করল তীক্ষ্ণদৃষ্টি,—যেন এক গোপন শত্রুকে সে আবিষ্কার করতে চাইছে।······

উদ্বেগজনক কয়েকটি মুহূর্ত···মহিষযূথ সরে যাচ্ছে দূরে···তীরবিদ্ধ মহিষ সঙ্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। সে এখনও বুঝতে পারছে না সঙ্গীদের অনুসরণ করা উচিত, না, তাদের ফিরে আসার জন্য হাঁক দেওয়া উচিত। মহিষ মনস্থির করার সময় পেল না, অ্যাংকোলে-শিকারী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার তীর ছুঁড়ল, তারপর শুয়ে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় তীরটা ঘাড়ের উপর বিঁধতেই ক্ষেপে গেল মহিষ। লোকটিকে সে দেখতে পাই নি বটে, কিন্তু তার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছে ধনুকের অস্পষ্ট টংকারধ্বনি—শব্দের দিক্ নির্ণয় করতেও মহিষের ভুল হল না।

যেদিক থেকে ধনুকের শব্দ এসেছে সেই দিকেই ছুটল মহিষ—

কিন্তু সোজা নয়—বৃত্তের আকারে গোল হয়ে ঘুরে এল জন্তুটা, সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাতাস থেকে শত্রুর গায়ের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। আত্তিলিও যে গাছটার উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই গাছ আর শায়িত নিগ্রো শিকারীর মধ্যবর্তী স্থানের মাঝামাঝি এসে মহিষ বোধহয় মানুষের গায়ের গন্ধ পেল, সে থমকে দাঁড়াল, বারবার বাতাসে ঘ্রাণ গ্রহণ করল—তারপর আবার কয়েক পা এগিয়ে এসে বাতাস শুঁকতে লাগল···অবশেষে মানুষটাকে সে আবিষ্কার করে ফেলল! ঠিক যে জায়গায় নিগ্রো শিকারী শুয়ে ছিল, সেই দিকেই ছুটল মহিষ। দিক্ নির্ণয়ে তার একটুও ভুল হয়নি, পদভরে মাটি কাঁপিয়ে সে ধেয়ে এল উল্কা বেগে।

গাছের উপর থেকে আত্তিলিওর মনে হল ধরাশায়ী মানুষটার উপর এসে পড়েছে একজোড়া প্রকাণ্ড শিং, এই বুঝি হতভাগ্য শিকারীকে মাটিতে গেঁথে দেয় একজোড়া জান্তব তরবারি—কিন্তু সেই রক্তাক্ত দৃশ্যে আত্তিলিওর চোখ দুটি পীড়াগ্রস্ত হওয়ার আগেই অকুস্থল থেকে একটা ধুলোর মেঘ লাফিয়ে উঠে তাঁর দৃষ্টি শক্তিকে আচ্ছন্ন করল। একটু পরেই জোর বাতাসের ধাক্কায় সরে গেল ধুলো। আত্তিলিও দেখলেন অ্যাংকোলে-শিকারী অক্ষত অবস্থায় মাটিতে, আর তার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে মহিষ। জন্তুটা অস্থিরভাবে মাটিতে পদাঘাত করছে এবং তার নাসিকা ও কণ্ঠ থেকে উদ্গীর্ণ হচ্ছে অবরুদ্ধ রোষের ভয়াবহ ধ্বনি।···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একটি নির্বিকার মানুষ

'যাক্ বাঁচা গেল!' আত্তিলিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলেন মহিষ পিছন ফিরে। কিন্তু না,—অত সহজে রেহাই দিল না যমদূত—ক্ষণিকের জন্য লাফিয়ে সরে গিয়েছিল মহিষ, তৎক্ষণাৎ ঘুরে এসে আবার মানুষটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে।

লোকটি একটুও নড়ছে না, তার ধরাশায়ী দেহে কোথাও জীবনের লক্ষণ নেই। তার সর্বাঙ্গে পড়ছে মহিষের তপ্ত নিঃশ্বাস, কানে আসছে রক্ত-জল-করা গর্জন ধ্বনি, খুরের আঘাতে কাঁপছে চার পাশের মাটি—তবু অ্যাংকোলে-শিকারীর দেহ নিস্পন্দ, নিশ্চল!

আন্তিলিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন নিজের উপর কতখানি কর্তৃত্ব থাকলে ঐ অবস্থায় মড়ার ভাণ করে পড়ে থাকা যায়।…

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর মহিষ ফিরে গেল। লোকটি তখনও ধরাশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল না। ভালই করল, কারণ—একটু দূরে গিয়েই আবার ফিরল মহিষ। আগের মতোই শায়িত মনুষ্যদেহের চারপাশে চলল মহিষাসুরের আস্ফালন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তারপর আবার পিছন ফিরে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল জন্তুটা।

আন্তিলিওর সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন ঘাম ছুটছে। তিনি এতক্ষণে বুঝেছেন কেন অ্যাংকোলে-জাতি এমন বিপজ্জনক পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে। তীরের বিষ মহিষের দেহে প্রবেশ করার অনেক পরে তার মৃত্যু হয়। একশ ফিটের বেশী দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মহিষকে কাবু করা সম্ভব নয়—কারণ, দূরত্ব খুব বেশী হলে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত করার ক্ষমতা কমে যায়। একশ ফিটের মধ্যে গাছে উঠে মহিষকে আঘাত করাও অসম্ভব—তীরের নাগালের মধ্যে আসার আগেই মহিষের দৃষ্টি বৃক্ষে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তৎক্ষণাৎ সে সবেগে স্থান ত্যাগ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনও গোপন স্থান থেকে মহিষকে তীরবদ্ধ করলে শিকারীর মৃত্যু অনিবার্য মহিষের তিনটি ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার ত্র্যহস্পর্শ যোগে মহিষ চটপট শিকারীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার দিকে ধাবিত হবে এবং তীরের বিষ মহিষের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে তার মৃত্যু ঘটনোর আগেই তীক্ষ্ণ শিং আর খুরের আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত এক মাংস পিণ্ডে

পরিণত হবে শিকারীর দেহ! ছুটে পালানো সম্ভব নয়, দ্বিপদ ও চতুষ্পদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় মানুষের জয়লাভের কোনও আশাই নেই।

মৃতদেহের প্রতি মহিষের অহিংস মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ না করলে, অ্যাংকোলে-শিকারীর পক্ষে অন্য কোন উপায়ে মহিষ মাংস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, সেই জন্যেই ধনুর্বাণ-সম্বল অ্যাংকোলে জাতি এমন বিপজ্জনক ভাবে মহিষ শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

আচ্ছা, এইবার কাহিনীর পূর্বসূত্র ধরে দেখা যাক আমাদের পরিচিত অ্যাংকোলে-শিকারীর ভাগ্যে কি ঘটল। মহিষ আরও কয়েকবার শিকারীর কাছে এসে ফিরে গেল—পাঁচ-পাঁচবার ঐভাবে ছুটোছুটি করার পর মহিষ যখন আরও একবার ঘুরে আসছে, সেই সময় আত্তিলিও দেখলেন জন্তুটা হঠাৎ হাঁটু পেতে বসে পড়ল—তারপর এক ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে শয্যাগ্রহণ করল মাটির উপর, আর উঠল না!

আত্তিলিও বুঝলেন মহিষের মৃত্যু হল; এতক্ষণ পরে কার্যকরী হয়েছে তীরের বিষ!

মহিষের মৃতদেহ থেকে প্রায় পনের ফিট দূরে শায়িত একটা নিশ্চল মনুষ্যমূর্তি হঠাৎ সচল হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দূরবর্তী মহিষযূথের প্রস্থানপথের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সর্বাঙ্গ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো টান করে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা টেনে নিল। বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর একবার ছুরির ধার পরখ করে নিয়ে অ্যাংকোলে-শিকারী তার পরবর্তী কর্মসূচী অনুসরণ করতে উদ্যত হল…

গাছ থেকে নেমে আত্তিলিও যখন লোকটির কাছে এসে পৌঁছালেন, সে তখন অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে 'জোবির' মৃতদেহের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। লোকটির ভাবভঙ্গী দেখে আত্তিলিওর

মনে হল সে যেন খুব সহজভাবে একটা দোকানের ভিতর বসে কসাই-এর কর্তব্য করছে—তার নির্লিপ্ত আচরণ দেখে কে বলবে একটু আগেই তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল মূর্তিমান মৃত্যুদূত !

লোকটির মাথা না তুলেই আত্তিলিওর উপস্থিতি অনুভব করল, নিবিষ্টচিত্তে মৃত পশুর চামড়াতে ছুরি চালাতে চালাতে সে বলল, 'একটু পরেই আমার পরিবারের সব এখানে এসে পড়বে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই ওই চমৎকার মাংস তারা নিয়ে যাবে।'

আত্তিলিও বললেন, 'কিন্তু জোবির বদলে যদি তারা তোমার মরা শরীরটা পড়ে থাকতে দেখতো, তাহলে কি হত ?'

সহজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে অ্যাংকোলে-শিকারী উত্তর দিল, 'আমার পরিবারের লোকরা তাহলে ছেঁড়া-খোঁড়া শরীরের টুকরোগুলো নিয়ে গ্রামের পিছনে পুঁতে ফেলতো। ঐখানে কোনও খারাপ পেতাত্মা যায় না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ভয়াবহ পরিস্থিতি

অ্যাংকোলে-শিকারীর অদ্ভুত কৌশল ও স্নায়ুর উপর আশ্চর্য সংযম দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলেন আত্তিলিও। কতখানি মানসিক শক্তি থাকলে মানুষ নির্বিকারভাবে ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর ধারণা সেদিন খুব স্পষ্ট ছিল না।

দু' বছর পরে তিনি নিজে যখন ঐ অবস্থায় পড়লেন, তখনই বুঝতে পারলেন কি অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো শিকারী।

খুব ভেবে দেখলে অবশ্য বলতে হয় আত্তিলিওর অবস্থা নিগ্রো শিকারীর চাইতেও খারাপ ছিল—অ্যাংকোলে-শিকারী স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল এবং এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তার পেশাগত শিক্ষা আর সুদীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতির ইতিহাসও

কর্তব্য—কিন্তু আত্তিলিও সাহেব কোনদিনই বন্য মহিষের মতো বদখৎ জানোয়ারের সম্মুখীন হওয়ার অভিলাষ পোষণ করেন নি, ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে এক অভাবনীয় বিপদের সামনে রুখে দাঁড়াতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

যখনকার কথা বলছি সেই সময়ে আত্তিলিও গত্তি আফ্রিকার কিভু হ্রদের তীরবর্তী সাময়িক আস্তানা থেকে ত্‌চিবিন্দা নামক স্থানের অরণ্যে অভিযান চালানোর জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁর অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল দানব-গরিলা। ঐ জীবটির সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

দৈবক্রমে একদিন আত্তিলিওর সঙ্গে একজন বেলজিয়ামের অধিবাসীর পরিচয় হয়ে গেল। ঐ লোকটি জানাল কিভু হ্রদ আর টাঙ্গানিকা হ্রদের মধ্যবর্তী প্রান্তরে তার সঙ্গে গেলে একদল মহিষের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারবেন আত্তিলিও সাহেব। গরিলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে সে সময় মাথা ঘামাচ্ছিলেন না আত্তিলিও, কিন্তু লোকটি বলল আড়াইশো মহিষ নিয়ে গঠিত ঐ প্রকাণ্ড দলটার ফটো তোলার কাজ চিড়িয়াখানাতে ফটো নেওয়ার মতোই সহজ। এত সহজে আড়াইশো মহিষের একটা প্রকাণ্ড দলকে তাঁর ক্যামেরাতে বন্দী করা যাবে শুনে রাজী হয়ে গেলেন আত্তিলিও।

'তুমি একটা উইএর ঢিপি বেছে নেবে।' লোকটি বলল, 'ঐ ঢিপির পিছন থেকে ফটো তুলবে। এমন সুযোগ আর কখনও পাবে না।'

বেলজিয়ানের কথায় খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আত্তিলিও গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হলেন। ব্যাপারটা মোটেই বিপদ্‌জনক নয়, চিড়িয়াখানাতে যাওয়ার মতোই সোজা—অতএব শিকারে যাওয়ার উপযুক্ত 'বুট' পরার প্রয়োজন মনে করেন নি আত্তিলিও; শহর-অঞ্চলে যে সাধারণ জুতো পরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন সেই জুতো

জোড়া পায়ে চড়িয়ে তিনি চললেন মহিষযূথের আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে—রাইফেলটা তিনি নিয়েছিলেন নিতান্ত অভ্যাস বশে। তাঁবুর লোকজন দরকারী কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই বাছাবাছি না করে যে নিগ্রোটিকে সামনে পেলেন তাকেই তিনি ডেকে নিলেন রাইফেলটা বহন করার জন্য। আত্তিলিও দুটো হাতই খালি রাখতে চেয়েছিলেন—লম্বা 'লেন্‌স্‌' আর ক্যামেরা ভালভাবে ব্যবহার করতে হলে দুই হাতই খালি রাখা দরকার। সবচেয়ে ভাল ক্যামেরাটাকেই সঙ্গে নিয়েছিলেন আত্তিলিও…

প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর বেলজিয়ান বন্ধুর নির্দেশে পথের উপর এক জায়গায় মোটরগাড়িটা থামানো হলো। ঘন উদ্ভিদের জালে আচ্ছন্ন একটা সরু পথের উপর দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল আত্তিলিও। লোকটি জানাল, নদীর যেখানে মহিষের দল সন্ধ্যার সময়ে জলপান করতে আসে সেই জায়গাটা সে ভালভাবেই জানে—খুব তাড়াতাড়ি চলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সে বলল, মহিষদের আসার সময় হয়েছে, এখনই তারা এসে পড়বে।

মিনিট দশেক হাঁটার পরে সকলে এসে থামল একটা খোলা জায়গার উপর। আত্তিলিও দেখলেন প্রচণ্ড সূর্যের তাপে শুষ্ক কর্দমপিণ্ডগুলোর মধ্যবর্তী স্থানের মাটি ফেটে দেখা দিয়েছে অজস্র ফাটল। হাঁটার সময়ে ঐ ফাটলে পা পড়লেই চিৎপটাং হওয়ার সম্ভাবনা। আত্তিলিও চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—ডান দিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে রুজিজি নদী, সামনে নাতিদীর্ঘ নলখাগড়ার নিবিড় সমাবেশ আর বাঁ দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল চোখে পড়ে উই ঢিপির পর উই ঢিপি। 'এখানে' অসংখ্য উইঢিপির মধ্যে একটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল বেলজিয়ান, 'ঐ জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। চটপট চলে যাও দেরি কোরো না।'

খুব চাপা গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছিল বেলজিয়ান বন্ধু;

তার মতোই স্বরে আত্তিলিও জানতে চাইলেন উক্ত ব্যক্তি কোথায় অবস্থান করতে চায়।

'আমাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,' লোকটি উত্তর দিল, 'কাছাকাছি থাকব।'

আত্তিলিও দেখলেন বেলজিয়ান তার নিজস্ব ভৃত্যকে নিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগল না। সমস্ত জায়গাটা খুব নির্জন অস্বস্তিকর। ফটো তোলার পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে সেই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারলে খুশী হতেন আত্তিলিও। তাঁর সঙ্গী বন্দুক-বাহক নিগ্রোটির মনোভাবও বোধহয় সেইরকম—অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে লোকটি হঠাৎ কথা কইতে শুরু করল। আত্তিলিও তার একটা কথাও বুঝতে পারলেন না। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ছয়টি ভাষায় তিনি লোকটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেখা গেল তাঁর ভাষাও লোকটির কাছে সমান দুর্বোধ্য! পর পর ছয়বার ভাষা থেকে ভাষান্তরে প্রবেশ করলেও আত্তিলিওর বক্তব্য ছিল একটি—'ওহে বাপু দয়া করে একটু চুপ করো তো!' মুখের ভাষা না বুঝলেও তাঁর কণ্ঠস্বর আর ভাবভঙ্গী থেকে লোকটি শেষ পর্যন্ত বক্তার বক্তব্য অনুধাবন করতে সমর্থ হল। সে চুপ করল।

পরে অবশ্য আত্তিলিও জানতে পেরেছিলেন ঐ লোকটি তাঁকে একটা জরুরী সংবাদ পরিবেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল—দুর্ভাগ্যক্রমে তার কথা আত্তিলিও বুঝতে পারেননি, আর সেইজন্যই যথাসময়ে খবরটা শুনে সতর্ক হওয়ার সুযোগ তাঁর হল না।

খবরটা হচ্ছে এই : বেলজিয়ানের চাকরের কাছে আত্তিলিওর বন্দুক-বাহক জানতে পেরেছিল যে, তারা নদী পার হয়ে বিপরীত তীর থেকে মহিষদের উপর গুলি চালিয়ে কয়েকটা জন্তুকে হত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। বেলজিয়ানটির কফির আবাদ আছে :

সেই আবাদে নিযুক্ত মজুরদের মাংস সরবরাহ করার জন্যই মহিষ শিকারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাঝখানে নদী থাকায় অপর পার্শ্বে অবস্থিত বেলজিয়ান-শিকারী ও তার ভৃত্যের অবস্থা দস্তুর মতো নিরাপদ। কিন্তু এপারে আর দুজন মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা যে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সে কথা অনুমান করেই আত্তিলিওকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করেছিল তাঁর বন্দুক-বাহক।

আত্তিলিওর পক্ষে অবশ্য নবপরিচিত বন্ধুর সদিচ্ছায় সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক নয়—প্রায় আড়াইশ' মহিষের মাঝখানে গুলি চালিয়ে দিলে তাদের কাছাকাছি থাকার ব্যাপারটা যে কারও কাছে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মতো সহজ মনে হতে পারে, এমন কথা আত্তিলিও সাহেবই বা ভাববেন কেমন করে? তিনি শুধু জানতেন মহিষের দল এখনই এসে পড়বে, অতএব চটপট একটা উইটিপির পিছনে আশ্রয় নেওয়া উচিত এই মুহূর্তে। দলটা এসে পড়লে আর নড়াচড়া করা সম্ভব হবে না। কয়েকশ' বন্য মহিষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন আত্তিলিও। নির্দিষ্ট উইটিপির পিছনে গিয়ে স্থান গ্রহণ করতে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। আত্তিলিও তাঁর 'টেলিফটোর অ্যাপারেটার' ঠিক করছেন নিবিষ্টচিত্তে—আচম্বিতে তাঁর পায়ের তলায় গুরুগম্ভীর শব্দ তুলে মাটি কাঁপতে শুরু করল। পিছন থেকে বন্দুকবাহক নিগ্রোর অস্ফুট ভয়ার্ত স্বর আত্তিলিওর কানে এল কিন্তু তিনি পিছনে চাইলেন না, তাঁর দুই চোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে সেইদিকে যেখানে নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে খোলা মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করছে মহিষের দল। আত্তিলিওর মনে হল সেই চলন্ত জান্তব স্রোতের যেন বিরাম নেই—কতগুলো মহিষ আছে ওখানে?......

ভয়ঙ্কর এবং চমকপ্রদ দৃশ্যটাকে আরও জমকালো করে তুলেছে অস্তায়মান সূর্যের আলোকধারা—

মাথার উপর জ্বলছে রক্তরাঙা আকাশের পট, তলায় এগিয়ে

চলেছে মেঘের মতো কালো এক শরীরী অরণ্য; সেই জীবন্ত ও চলন্ত অরণ্যের মাথায় মাথায় বাঁকা তলোয়ারের মতো শিংগুলোতে জ্বলে জ্বলে উঠছে রক্তলাল রবিরশ্মি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কম্পিত পৃথিবী করছে ধূলি-উদ্‌গিরণ! অপূর্ব দৃশ্য! *

আত্তিলিও মনে মনে তাঁর নবপরিচিত বন্ধুকে ধন্যবাদ দিলেন, সে ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে ফটো তোলা সবচেয়ে সুবিধাজনক। হাওয়ার গতি অবশ্য ভাল নয়, তবে মহিষরা যে তাঁর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারবে না, সে বিষয়ে আত্তিলিও গত্তির মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

চব্বিশটা আলোকচিত্র গ্রহণ করার পর আত্তিলিও ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় ম্যাগাজিন থেকে ব্যবহৃত ফিল্ম সরিয়ে নূতন ফিল্ম সংযোগ করতে সচেষ্ট হলেন। নীচু হয়ে ঐ কাজ করছিলেন তিনি। পুরানো ফিল্ম সরিয়ে নতুন ফিল্ম লাগাতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে। তবে আত্তিলিওর বোধহয় মিনিট খানেকের উপর আরও ত্রিশ সেকেণ্ড লেগেছিল; কারণ তাঁর পায়ের তলায় তখন জেগে উঠেছে প্রচণ্ড কম্পন—শত শত চলন্ত চতুষ্পদের পদাঘাতে মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পের মতো!

ক্যামেরাতে নতুন ফিল্ম লাগিয়ে আত্তিলিও আবার উইঢিপির আড়াল থেকে মুখ বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চমক! মহিষযূথ খুব কাছে চলে এসেছে! এমন অপ্রত্যাশিত সান্নিধ্য আত্তিলিওর ভাল লাগল না। জন্তুগুলো তাঁর ডানদিক দিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে তাদের গতিপথ একটু বদলে যাওয়ার ফলেই মহিষযূথ তাঁর কাছাকাছি এসে পড়েছে।

অবশ্য জন্তুগুলোর মধ্যে কোনও উত্তেজনা বা উগ্রতার চিহ্ন দেখা দেয়নি। তবু আত্তিলিও ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন।

মহিষের দল সোজাসুজি নদীর দিকে এগিয়ে গেলেই তিনি আবার ক্যামেরা হাতে নেবেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ ক্যামেরার চাইতে রাইফেলের সান্নিধ্য বেশী বাঞ্ছনীয়।

দৃষ্টি সামনে রেখে তিনি পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। শিকারীর প্রসারিত হস্তের এই ইঙ্গিত প্রত্যেক বন্দুক-বাহকের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত—কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও রাইফেলের স্পর্শ পেলেন না আভিলিও সাহেব। সম্মুখে চলমান ভয়ঙ্কর মিছিল থেকে চোখ ফেরানো নিরাপদ নয়, তাই চোখের দৃষ্টি যথাস্থানে রেখেই তিনি চাপা গলায় ডাকলেন—'এই!'

ফল হলো একই রকম, প্রসারিত হস্তের মতো অবরুদ্ধ কণ্ঠের ইঙ্গিতও হল ব্যর্থ—হাতে এসে পৌঁছাল না রাইফেল।

লোকটা কি গাধা নাকি? সক্রোধে দুই চোখে আগুন ছড়িয়ে পিছন ফিরলেন আভিলিও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল বিদ্যুৎ তরঙ্গ—

কেউ নেই পিছনে!

লোকটা যে কখন পালিয়েছে বুঝতেই পারেননি আভিলিও। এখন তার দ্রুত ধাবমান দেহটা তাঁর চোখে পড়ল। এর মধ্যেই সে অনেক দূর চলে গেছে, তার শরীরটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। নদী থেকে লোকটির দূরত্ব এখন একশ গজও হবে না।

আভিলিও মনে মনে ভাবলেন, 'মহিষগুলো নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পেয়েছে। সেইজন্যই তাদের গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে।'

কিন্তু তাঁর ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে তো সমূহ বিপদ। মহিষরা যে পথ ধরে এগিয়ে আসছে, সেই পথের মাঝখানেই তো রয়েছেন তিনি—একটু পরেই তো আড়াইশ' মহিষের দল এসে পড়বে তাঁর উপর! এখন উপায়!

বন্দুক বাহক নদীর ধার থেকে একবার আভিলিওর দিকে তাকাল, হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল রাইফেলটা সে ঐখানেই রেখে দিয়েছে—

তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। জল ছিটকে উঠল, আর তাকে দেখা গেল না।

আন্তিলিও এইবার মহিষযূথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারা এগিয়ে আসছে একই ভাবে, তবে তাদের গতিবেগ বর্ধিত হয়নি, বেশ হেলে-দুলে সহজভাবেই এগিয়ে আসছে তারা।

'একটি লোককে ছুটতে দেখেও যখন তারা উত্তেজিত হয়নি, তখন আর একটি লোকের ধাবমান শরীরও বোধহয় তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে না—ভাবলেন আন্তিলিও।

দূরত্বটা চোখ দিয়ে মেপে নিলেন তিনি—'নিতান্তই যদি তেড়ে আসে তাহলেও আমাকে ওরা ধরে ফেলার আগেই আমি রাইফেলটার কাছে গিয়ে পড়ব।'

সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি ছুটতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ—পর পর তিনবার। আন্তিলিও ভাবলেন তাঁর বেলজিয়ান বন্ধু বন্দুকের শব্দে মহিষগুলোর দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করে তাঁকে সাহায্য করতে চাইছে। কথাটা ভাবতেই তাঁর মনের জোর বাড়ল, আরও জোরে পা চালিয়ে ছুটতে লাগলেন তিনি।

আবার বন্দুকের শব্দ। ডান পায়ের গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। ছিটকে পড়লেন আন্তিলিও। ক্যামেরাটা দারুণ জোরে তাঁর বুকে আঘাত করল। মাটিতে আছাড় খেয়ে ভ্রূ থেকে ঝরতে লাগল রক্তের ধারা। একবার উঠতে চেষ্টা করলেন আন্তিলিও। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। আন্তিলিও ভেবেছিলেন তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে, কিন্তু না, তা নয়—পাথরের মত শক্ত মাটির ফাটলে তাঁর পা আটকে গেছে। ফাটলের গ্রাস থেকে পা টেনে বার করলেন আন্তিলিও। পা মচকে গেছে ভীষণ ভাবে, গোড়ালির হাড় ভেঙ্গে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। মহিষের দল ওদিকে ভীষণ উত্তেজিত। গুলি খেয়ে কয়েকটা জন্তু মারা পড়েছে। সমস্ত দলটা এখন আন্তিলিওর দিকেই ছুটে আসছে।

একবার পা ফেলার চেষ্টা করেই থেমে গেলেন আত্তিলিও। নদী সামনে, একটি দৌড় দিলেই তিনি নিরাপদ—

কিন্তু দৌড়ানো তো দূরের কথা সহজভাবে হেঁটে চলার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল অ্যাংকোলে-শিকারীর কথা। মড়ার ভান করে পড়ে থেকে সেই লোকটি মহিষকে ফাঁকি দিয়েছিল। অতি দুঃখে আত্তিলিওর হাসি এল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর, সর্বশরীর কাঁপছে থর থর করে—মৃতদেহের অভিনয় করার এইটাই তো উপযুক্ত সময়!

অ্যাংকোলেকে পরীক্ষা করেছিল একটি মহিষ, তাঁকে পরীক্ষা করতে আসবে আড়াইশ' মহিষের বিপুল বাহিনী।

নাঃ, অসম্ভব. আত্তিলিওর পক্ষে মড়ার ভান করে এই চতুষ্পদ মৃত্যুদূতদের ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সুপ্তচেতনা ভেদ করে জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করল এক আধপাগলা ইংরেজ শিকারীর কণ্ঠস্বর—'মনে রেখ, ওরা মাথা তুলে রাখে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে'…

হ্যাঁ, উপায় আছে! একটি মাত্র পন্থা অবলম্বন করলে হয়তো যমদূতদের কবল থেকে উদ্ধারলাভ করা সম্ভব—নতুন আশায় বুক বাঁধলেন আত্তিলিও। মহিষ চরম আঘাত হানবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মাথা তুলে শত্রুকে লক্ষ্য করে; অতএব ধাবমান মহিষযূথকে যদি তিনি হঠাৎ চমকে দিতে পারেন, তবে হয়তো জন্তুগুলো তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে।

আত্তিলিও জানতেন মহিষের চক্ষু বিবর্ধক শক্তিসম্পন্ন। তাঁর সামান্য গতিবিধি তাদের চোখে ধরা পড়বে অসামান্য দ্রুতবেগে বর্ধিত আকারে—অতএব দুই হাত নেড়ে যদি তিনি তাদের ভড়কে দিতে পারেন, তাহলে তিনি হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

আড়াইশো ধাবমান মহিষের সামনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবশ্য খুবই কঠিন, কিন্তু হাত নেড়ে চীৎকার করা ছাড়া বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার যখন অন্য উপায় নেই, তখন উপরোক্ত বিপজ্জনক পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করার সংকল্প করলেন আন্তিলিও—

একটান মেরে মাথা থেকে তিনি খুলে ফেললেন হেলমেট, প্রস্তুত হলেন চরম মুহূর্তের জন্য···

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শরীরী ঝটিকার গতিপথে

পায়ে পায়ে জাগছে ভূমিকম্প, শৃঙ্গে শৃঙ্গে জ্বলছে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ, ধেয়ে আসছে মূর্তিমান মৃত্যুর শরীরী ঝটিকা—

আড়াইশ' মহিষের উন্মত্ত বাহিনী !

কখন যে তারা এসে পড়েছে বুঝতে পারেননি আন্তিলিও, তিনি শুধু চীৎকার করছেন গলা ফাটিয়ে আর মাথার হেলমেট খুলে সজোরে নাড়ছেন সেটাকে—ডাইনে, বাঁয়ে, মাথার উপর—সর্বত্র ! জন্তুগুলো তাঁর এত কাছে এসে পড়েছিল যে, মহিষ দলপতির খোলা চোখ দুটোকেও তিনি দেখতে পেলেন। ভাবলেশহীন নির্বিকার দৃষ্টি মেলে জন্তুটা তাঁর দিকে তাকিয়েছিল নির্নিমেষ নেত্রে। দারুণ আতঙ্কে আন্তিলিও চোখ মুদে ফেললেন, কিন্তু তাঁর হাত দুটো যন্ত্রের মতো ঘুরতে লাগল—ঐ অঙ্গ দুটি যেন তাঁর নিজস্ব নয়, হঠাৎ যেন হাতের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তিনি—অদৃশ্য এক শক্তি যেন হাত দুটিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে বারংবার !

মুদিত নেত্রে সজোরে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি, সেইসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার—চোখে না দেখতে পেলেও তাঁর শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করতে লাগল অনেকগুলো গুরুভার দেহের প্রচণ্ড পদধ্বনি। দ্রুত ধাবমান সেই ধ্বনি তরঙ্গ তাঁর দুপাশ দিয়ে ছুটে চলেছে ডাইনে

আর বাঁয়ে···অবশেষে একসময়ে আন্তিলিওর পিছনে বহু দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল বিলীয়মান শব্দের ঢেউ-দূরে অপসৃত মৃত্যুর পদধ্বনির মতো······

যাক! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আন্তিলিও! এই যাত্রা বেঁচে গেছেন তিনি! হাতে রাইফেল না থাকায় তিনি ভেবেছিলেন এইবার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পরে বুঝলেন নিরস্ত্র ছিলেন বলেই তিনি অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। রাইফেল হাতে থাকলেই গুলি চালাতেন তিনি, কিন্তু লাভ কি হতো? কয়েকটা জন্তু গুলি খেয়ে মারা পড়তো, তারপরই তাঁর দেহের উপর দিয়ে ছুটে যেতো চতুষ্পদ জনতার জান্তব ঝটিকা—শত শত খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতেন তিনি, প্রান্তরের বুকে একদা-জীবিত মনুষ্যদেহের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পড়ে থাকতো দলিত, বিকৃত, রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ড!

মহিষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যার অমূল্য উপদেশ যথাসময়ে স্মরণে আনতে পেরে বেঁচে গেলেন আন্তিলিও, সেই ইংরেজ-শিকারী কিন্তু সময়কালে নিজের অভিজ্ঞতাব কথা ভুলে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল এবং তার ফলেই মৃত্যুবরণ করেছিল সে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

আন্তিলিও জানতেন বর্তমানে তিনি নিরাপদ। তবে বেশীক্ষণ স্থায়ী নয় সেই নিরাপত্তা। মহিষযূথ এখনই আবার ফিরে আসবে। যেভাবে অ্যাংকোলে-শিকারীর কাছে ছয়-ছয়বার ঘুরে এসেছিল একক মহিষ 'জোবি', ঠিক সেইভাবেই তাঁর কাছে ঘুরে আসবে মহিষের দল—পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন আন্তিলিও গত্তি।

অনুমান নির্ভুল। ঘুরে এসেছিল মহিষযূথ। তবে আন্তিলিওকে তারা দেখতে পায় নি। পা ভেঙেছে কি আস্ত আছে সে বিষয়ে একটুও মাথা না ঘামিয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা তুচ্ছ করে তিনি ছুটেছিলেন

নদীর দিকে। মহিষগুলো যখন অকুস্থলে ফিরে এসেছিল, আত্তিলিও তখন নদীতীর থেকে বন্দুক-বাহকের পরিত্যক্ত রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝাঁপ খেয়েছেন নদীর জলে। প্রায় পাঁচ ফিট গভীর কর্দমাক্ত জলের ভিতর দিয়ে রাইফেলে ভর দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন এবং অতি কষ্টে নদী পার হয়ে পৌঁছালেন নিরাপদ স্থানে। তীরবর্তী কাদার উপর হামাগুড়ি দিতে দিতে শক্ত জমির উপর একসময়ে এসে পড়লেন আত্তিলিও। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বেলজিয়ান 'বন্ধু'!

আত্তিলিওর শোচনীয় অবস্থা তার নজরেই পড়ল না। মহানন্দে চীৎকার করে সে বলে উঠল, 'কি? কেমন দেখলে? আমি তোমায় বলেছিলাম কিনা'......

আত্তিলিও সাহেবেরও অনেক কিছু বলার ছিল। বলেন নি। কারণ, কথা বলতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর স্বরযন্ত্র কিছুক্ষণ পর্যন্ত মৌনব্রত পালন করতে চায়—অতএব 'বন্ধু' সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যক্তিগত অভিমত জানানোর জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, সেই বক্তব্যকে তিনি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন।

'আমি তোমায় বলেছিলাম কি না?' প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বন্ধুবর বলল, 'ঠিক চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মতোই সহজ হবে ব্যাপারটা—এখন দেখলে তো?'

হ্যাঁ, সবই দেখলেন আত্তিলিও, সবই শুনলেন। পরে তিনি বন্ধুকে কি বলেছিলেন জানি না। কারণ, আত্তিলিও গত্তি তাঁর আত্মজীবনীতে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করেন নি। তবে বাক্‌শক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে 'বন্ধুকে' বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এবং সেই ভাষণের ফলে উভয়ের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় হয়েছিল বলে মনে হয় না।

সৈনিকের চতুর্থ অভিজ্ঞতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নূতন অভিযানের উদ্যোগ

এই কাহিনীর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে কম্যাণ্ডার আস্তিলিও গত্তি আফ্রিকাবাসী যাবতীয় মহিষকেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শত্রু বলে মনে করতেন। মহিষ সম্বন্ধে কম্যাণ্ডার সাহেবের এমন অদ্ভুত বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠার মূলে যেসব কার্যকারণ বর্তমান ছিল, সেই সব ঘটনার বিবরণ প্রথম খণ্ডের পাঠকদের অজানা নয়। রাইফেলে সিদ্ধহস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ও শৃঙ্গধারী মহাকায় মহিষের মধ্যে স্থাপিত তুলনামূলক শত্রুতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় উভয় পক্ষই আঘাত হানতে বিলক্ষণ পটু, জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ আর যোদ্ধাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর—অতএব এই শত্রুতা সমানে-সমানে হয়েছিল বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু পরস্পরবিরোধী যে দুটি শত্রুর সংঘাতের ফলে বর্তমান কাহিনীর অবতারণা তাদের মধ্যে এক পক্ষ ছিল দানবের মতো বিপুল দেহ ও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী—অপর পক্ষ খর্বকায় দুর্বল, নগণ্য ; মহাবলিষ্ঠ শত্রুর এক চপেটাঘাতেই তার মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

অতিকায় দানব ও খর্বকায় মানবের অসম শত্রুতার ফলে ক্ষুদ্র দেহধারী বামনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বামনই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল যে অস্ত্রের সাহায্যে এমন অসাধ্যসাধন করতে সে সমর্থ হয়েছিল, সেই অস্ত্রটি হচ্ছে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আস্তিলিও সাহেব পূর্বোক্ত দুই শত্রুর মাঝখানে এসে পড়েছিলেন নিতান্ত ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে, রাইফেল হাতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলাও করেছিলেন তিনি আদর্শ

সৈনিকের মতো—কিন্তু এই কাহিনীর নায়ক নন আন্তিলিও গত্তি। প্রকৃত নায়কের সম্মান কাকে দেওয়া যায় সেই বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি এইবার কাহিনী শুরু করলাম সেখান থেকে, যেখানে ঠ্যাং ভেঙ্গে আত্তিলিও তাঁবুর ভিতর শয্যা-গ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, শয্যা না নিয়ে আর উপায় কি? মহিষের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণের যে কি দুরবস্থা হয়েছিল সে কথা নিশ্চয়ই প্রথম খণ্ডের পাঠকদের মনে আছে। মধ্য আফ্রিকার 'বাকাভা' অঞ্চলে অবস্থিত কিভু নামক বৃহত্তম হ্রদের তীরে তাঁবুর ভিতর শুয়ে আত্তিলিও তাঁর ভাঙ্গা পা সুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন আর স্বপ্ন দেখছিলেন।

স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবশ্য অন্য লোকের কাছে খুব মনোরম লাগবে না। আত্তিলিওর স্বপ্ন যদি চোখের সামনে নিরেট দেহ নিয়ে দাঁড়ায়, তবে অধিকাংশ মানুষই যে আতঙ্কে চমকে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্তিলিও সাধারণ মানুষ নন, বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন—তাই দূরে দৃশ্যমান অরণ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন—তাই দূরে দৃশ্যমান অরণ্য-সজ্জিত পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে তিনি যে জীবটির স্বপ্ন দেখতেন, সে হচ্ছে আফ্রিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বানর জাতীয় জীব—দানব-গরিলা।

কিভু হ্রদের অদূরে বিরাজমান ঐ পর্বতশ্রেণীর উপর হাজার হাজার বছর ধরে যে মহারণ্য রাজত্ব করছে, সেখানে কোনও মানুষ বাস করে না। অতি দুঃসাহসী পিগমি জাতিও সেখানে কেবলমাত্র আলোতে প্রবেশ করতে সাহস পায়। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের নিবিড় অন্তঃপুর থেকে প্রতি প্রভাতে শিশু সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়ে তীব্রস্বরে ডেকে ওঠে দানব-গরিলা। মানুষের যাতনা-কাতর আর্তনাদের মতো অতিকায় কপিকণ্ঠের সেই রবি-বন্দনা কানে গেলে শ্রোতার সর্বাঙ্গে জেগে ওঠে

আতঙ্কের শিহরণ। ঐভাবে চিৎকার করে প্রভাত-সূর্যকে অভ্যর্থনা জানায় বলেই স্থানীয় মানুষ গরিলার নাম দিয়েছে 'ন্‌গাগি' অর্থাৎ 'রাত্রির যে অবসান ঘটায়।' গরিলার কণ্ঠস্বরে সাড়া দিতেই যে সূর্যদেব প্রত্যহ পূর্বাচলে আত্মপ্রকাশ করেন এ বিষয়ে পিগমি জাতির সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

পিগমিরা দু'দুবার খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল তারা আত্তিলিওকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তাঁর জন্য তারা অপেক্ষা করছে সাগ্রহে। পিগমিদের খবর পেয়ে গরিলার সন্ধানে যাত্রা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে-ছিলেন আত্তিলিও, কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে তখনই অভিযান শুরু করতে পারছিলেন না।

তাঁর মানসিক অবস্থা বোধহয় আহত অঙ্গটিকে আরোগ্যলাভ করতে সাহায্য করেছিল, কারণ অপ্রত্যাশিতভাবে চিকিৎসক তাঁকে জানালেন গোড়ালির হাড় জোড়া লেগে গেছে, আত্তিলিও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

বেলজিয়ামের উপনিবেশ-মন্ত্রীর হাত থেকে অনেক কষ্টে দানব-গরিলার বাসস্থানে প্রবেশ করার একটা 'পারমিট' বা ছাড়পত্র আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন আত্তিলিও। ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া খুব কঠিন, তবে কয়েকটা অভিযানে সাফল্যলাভ করেছিলেন বলেই আত্তিলিও সাহেব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিন মাস পর্যন্ত নিষিদ্ধ বনভূমিতে বাস করার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে একটি দানব-গরিলা শিকারের অনুমতিও দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। তবে নিছক শিকারের বাসনা চরিতার্থ করতে গেলে সরকারের অনুমতি পাওয়া যেতো না,—আত্তিলিও সাহেব নিহত গরিলার দেহ নিদর্শন হিসাবে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'উইটওয়াটার্‌স্‌র‍্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি অব জোহানেসবার্গ।'

দেরীর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন আত্তিলিও। চিকিৎসক

যেদিন পায়ের অবস্থা সন্তোষজনক বলে রায় দিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আন্তিলিও সাহেব প্রাদেশিক কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন। কমিশনারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও যেসব কথা উক্ত ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনেছিলেন আন্তিলিওর কানে তা আদৌ মধুবর্ষণ করে নি। কমিশনার সাহেব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন একটির বেশী গরিলাকে কোন কারণেই হত্যা করা চলবে না। আত্মরক্ষার ছুতোয় তিনি রাজী নন, কারণ এর আগে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ জঙ্গলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অনেকগুলো গরিলাকে হতাহত করেছে। আহতদের সংখ্যা নিহতদের চাইতে বেশী। হত্যাকারীরা অবশ্য বলেছে আত্মরক্ষার জন্যই তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কমিশনার তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কমিশনার সাহেব আন্তিলিওকে জানিয়ে দিলেন ঐ ধরনের ঘটনা ঘটলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। 'কঠোর শাস্তিটা' কি রকম হতে পারে জানতে চেয়ে আন্তিলিও শুনলেন অর্থদণ্ডের পরিমাণ খুব কম করে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক এবং কঙ্গো থেকে বহিষ্করণ। অবশ্য বহিষ্করণের আগে একবার জেল খাটতে হবে, তবে জেলের মেয়াদ কতদিন হতে পারে সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারছেন না কমিশনার।

জেল! জরিমানা! বহিষ্করণ!—আন্তিলিও হতভম্ব!

কমিশনার বিনীতভাবে জানালেন, একটু কড়াকড়ি করতে হয়েছে। গরিলারা দুষ্প্রাপ্য জীব, বিশেষ করে অতিকায় দানব-গরিলা অতিশয় দুর্লভ—তাই সরকার তাদের রক্ষা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

"ঠিক আছে," আন্তিলিও বললেন, "আপনার অমূল্য গরিলাদের মধ্যে একটির বেশী জন্তুকে লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুঁড়ব না। প্রাণ গেলেও আমার কথার নড়চড় নেই জানবেন।"

আন্তিলিও চলে এলেন। কমিশনার তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসারা উচ্চভূমিতে অবস্থিত জঙ্গলের

কাছে যেতেই ভয় পাচ্ছিল, ভিতরে যাওয়া তো দূরের কথা। কমিশনারের চেষ্টাতেই কয়েকটি নিগ্রো আত্তিলিওর সঙ্গী হতে রাজী হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ঐ ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন আত্তিলিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ 'মাম্বুটি পিগমি'

সারাদিন ধরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে আর কষ্টকর-ভাবে পথ চলার পর আত্তিলিও সদলবলে এসে পৌঁছালেন পাহাড়ের উপর একটা সমতলভূমিতে। ঐ সমতলভূমির পিছনে বিরাজ করছিল অরণ্যের সবুজ প্রাচীর। খোলা জায়গাটার উপর সকলে এসে দাঁড়াতেই আত্তিলিওর অনুচরদের ভিতর থেকে উঠল প্রবল হাস্য-ধ্বনি। হঠাৎ লোকগুলোর এমন হাসিখুশি হয়ে ওঠার কারণটা কি হতে পারে ভেবে এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন আত্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ পড়ল একদল অতি খর্বকায় মানুষের দিকে। সেই বেঁটে বেঁটে বামনদের দেহে ছিল নামমাত্র আবরণ, তাদের উচ্চতা ছিল চার ফিটের মতো—বামনদের সবচেয়ে লম্বা লোকটির দৈর্ঘ্য চার ফিট ছয়-ইঞ্চির বেশী হবে না। লোকগুলোর ছোট ছোট কুঞ্চিত মুখের সঙ্গে বাঁদরের মুখের সাদৃশ্য খুব বেশী। ঐ রকম কুৎসিত মুখ খর্বকায় দেহের মধ্যস্থলে সুগোল উদরের স্ফীতি আর সরু সরু পা দেখে মাম্বুটি পিগমি জাতিকে যদি কেউ খুব হাস্যকর মনে করে তাহলে তাকে বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মাম্বুটি পিগমিদের দলে যে ছোটখাট বৃদ্ধটি ছিল, সে আত্তিলিওর নিগ্রো অনুচরদের হাস্যস্রোত পছন্দ করল না। বৃদ্ধের মাথা থেকে ঝুলছিল একটা বেবুনের চামড়া, তার নাকের গড়নও ছিল অদ্ভুত—হাড়ের উপর অংশ চ্যাপ্টা, তলার দিকটা হঠাৎ ঠেলে উঠেছে উপর দিকে। দুই চোখে বন্য উগ্রতায় জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে পূর্বোক্ত নিগ্রোদের দিকে

একবার কটাক্ষপাত করল বৃদ্ধ—এমন ভয়ংকর সেই চোখের প্রভাব যে, তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল হাস্যধ্বনি, সকলের মুখে উঠল গাম্ভীর্যের নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি।

"ইয়াম্বো, বাওয়ানা (সুপ্রভাত মহাশয়)", বৃদ্ধ বলল।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বর্শাতে ভর দিয়ে সে হেলে দাঁড়াল।

তার দুই চোখ এখন আভিলিওর দিকে। দৃষ্টিতে বন্দত্বপূর্ণ কৌতূহলের আভাস। কেউ বৃদ্ধের পরিচয় না দিলেও আভিলিও বুঝলেন সে হচ্ছে পিগমিদের অধিনায়ক সুলতানি কাসিউল্লা—কয়েক দিন ধরে সে অপেক্ষা করছে আভিলিওর জন্য।

"ইয়াম্বো, বাওয়ানা," বৃদ্ধের সঙ্গীরা সমস্বরে অভ্যর্থনা জানাল। চোখের ভাষা যে পড়তে জানে সে পিগমিদের ঝকঝকে চোখগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝবে বামনরা নির্বোধ নয়। একটি পরেই যে নবাগত সাদা-চামড়ার মানুষটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই আগন্তুককে দুই চোখ দিয়ে জরীপ করে নিচ্ছে খর্বকায় পিগমিরা—বুঝে নিতে চাইছে লোকটি কেমন হবে।

মুহূর্তের মধ্যেই পিগমিদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন আভিলিও। ছোটখাট লোকগুলোকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেল। পিগমিরা আভিলিওর মনোভাব বুঝতে পারল। তৎক্ষণাৎ তারা তাঁবু ফেলার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ। মোটবাহকরা চটপট শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পারিশ্রমিক নেবার জন্য। প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকগুলো দৌড় দিল—লোভনীয় বখশিস 'টম্বাকো' (তামাক) নেবার জন্য তারা এক মুহূর্ত দেরী করল না। তাদের অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুবই পরিষ্কার আভিলিওর কাছে—রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই লোকগুলো স্থান ত্যাগ করতে চায়। তাদের বিবেচনায় এই অঞ্চল রাত্রিকালে ঘোরতর বিপদজনক।

পিগমিরা এর মধ্যে গাছের ডালপালা দিয়ে একটা সাময়িক

আচ্ছাদন নিজেদের জন্য তৈরি করে ফেলেছে এবং অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আত্তিলিওর রাঁধুনির রান্নার স্বাদ গ্রহণ করছে নিবিষ্টচিত্তে। রান্না তো ভারি, গাদা গাদা সিদ্ধ ডাঁটা। কিন্তু সেই খাদ্য পেয়েই তারা খুব খুশী, আর রাঁধুনিও তাদের পরিতুষ্ট করতে ব্যস্ত। একটু আগেই তার অট্টহাস্য যে পিগমিদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল সেই কথা সে ভোলে নি, অপ্রীতিকর ব্যাপারটা মুছে ফেলে সে পিগমিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : 'ন্‌গাগি'

খুব ভোরে পাশবিক চিৎকারের শব্দে আত্তিলিওর ঘুম ভেঙে গেল। এমন উৎকট আওয়াজ আগে কখনও শোনেন নি তিনি। তবু চিৎকারের কার্যকারণ অনুমান করতে তাঁর ভুল হল না। চটপট তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন আত্তিলিও। পিগমিরা আগেই উঠেছে এবং অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে পড়েছে।

উত্তেজিত স্বরে আত্তিলিও প্রশ্ন করলেন, "ন্‌গাগি?"

পিগমিদের নেতা কাসিউলা গম্ভীরভাবে বলল, "ন্‌দিও, ন্‌গাগি (হ্যাঁ, গরিলা)।"

সমবেত পিগমিরা মাথা নেড়ে সর্দারের কথায় সায় দিল। তারপর সদ্য জাগ্রত শিশু সূর্যের দিকে আঙুলি নির্দেশ করল। আত্তিলিওর পায়ের তলায় অবস্থিত উঁচু জমিটার অনেক নীচে কিভু হ্রদের জল যেখানে আয়নার মতো ঝকঝক করছে, মনে হল সেই তরল আয়নার উপর থেকেই উঠে আসছে প্রভাত সূর্য।

কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ চলতে শুরু করলেন আত্তিলিও। সঙ্গে রইল খর্বকায় পিগমি পথ-প্রদর্শকের দল।

আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আব্রুলিও ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এমন কষ্টকর পথ চলার অভিজ্ঞতা তাঁর কখনও হয় নি। পথ বলতে কিছু নেই—ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ, ঝোপ, লতা, ঘাসজঙ্গল প্রভৃতি নিয়ে গঠিত উদ্ভিদের প্রাচীর ভেদ করে এগিয়ে যেতে যেতে প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে ওঠে সর্পাঘাতের সম্ভাবনা। মাথার উপর ডালপালা আর লায়ানা লতার মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকলে তাকে ছোবল মারার আগে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়; পায়ের কাছে যেখানে শুকনো ঝরা পাতা আর শ্যাওলার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় সেখান থেকেও লুকিয়ে-থাকা সাপ যে কোন মুহূর্তে ছোবল বসাতে পারে—শুধু তাই নয়, এদিক-ওদিক তাকিয়ে যদিও ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, তবু প্রতি মুহূর্তে ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে আত্মগোপনকারী হিংস্র পশুর আক্রমণের আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা চমকে চমকে উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে চোখে পড়ে বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা। কয়েকটা বিচিত্র ধরনের কীট আব্রুলিওর পরিচিত নয়, সেগুলোকে তাঁর আরও বেশী ভয়ানক বলে মনে হল। কাঁটাগাছের ডালগুলো তাদের ধারালো আলিঙ্গনের চিহ্ন বসিয়ে দিতে লাগল আব্রুলিওর পরিচ্ছদ আর চামড়ার উপর, অসংখ্য নাম-না-জানা গাছের বিষাক্ত স্পর্শে ফুলে ফুলে উঠল তাঁর মুখ আর হাত, সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো জ্বালা-যন্ত্রণা। এর উপর আবার শ্বাসকষ্টও ছিল—উচ্চভূমির ভারি বাতাস টানতে তাঁর বিলক্ষণ কষ্ট হচ্ছিল, কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পরই তাঁর দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপসা, কান করতে লাগল ভোঁ ভোঁ! দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেল আঁকড়ে ধরে অতিকষ্টে এগিয়ে যেতে লাগলেন আব্রুলিও সাহেব।

আব্রুলিওর সঙ্গী কাসিউলা নামক পিগমিদের নেতা এবং তার বারোজন অনুচর খুব সহজেই পথ চলছিল। উদ্ভিদের জটিল জালের ভিতর দিয়ে তাদের ছোটখাট শরীর চটপট পথ করে

নিচ্ছিল, কিন্তু মস্ত গুরুভার দেহ নিয়ে আত্তিলিও যাচ্ছিলেন আটকে—তিনি যখন গাছপালার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে পথ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং পায়ের তলায় গর্তগুলো দেখতে না পেয়ে ধপাধপ আছাড় খাচ্ছেন, পিগমিরা তখন হালকা শরীর নিয়ে গর্তের উপরের ঘাসপাতা মাড়িয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে! তাদের জুতো ছাড়া খালি পা খুব সহজেই নরম মাটি, শ্যাওলা ও শিকড়-বাকড়ের উপর চেপে পড়ছে—কিন্তু আত্তিলিও সাহেবের জুতো-পরা পা যাচ্ছে পিছলে আর পিছলে, তিনি খাচ্ছেন হোঁচটের পর হোঁচট! জঙ্গলের ছায়ার মতোই নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে পিগমিরা, আবার ফিরে এসে সর্দারকে সামনের পথের খবরাখবর দিচ্ছে ফিসফিস করে, তারপরই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে ভুতুড়ে ছায়ার মতো!......

আচম্বিতে আত্তিলিওর খুব কাছেই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল এক তীব্র চিৎকার! ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জনের চাইতেও ভয়ঙ্কর, যাতনা-কাতর কুকুরের কান্নার চাইতেও করুণ, মরণাহত মানুষের আর্তনাদের চাইতেও ভয়াবহ সেই চিৎকার শুনেছিলেন আত্তিলিও, এই শব্দটা মোটেই সে রকম নয়। প্রথম চিৎকারের পরেই খুব খুব কাছ থেকে আরও অনেকগুলো কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল—কণ্ঠস্বরগুলো একই রকম তীব্র, একই রকম উগ্র, একই রকম ভয়ঙ্কর! তারপর আবার সব চুপচাপ!

চিৎকারগুলো যে গরিলাদের কণ্ঠ থেকেই এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু জন্তুগুলো কোথায় অবস্থান করছে বুঝতে পারলেন না আত্তিলিও। গাছের পাতার কম্পনও তাঁর চোখে পড়ল না, তাই তাদের গতিবিধিও ধরতে পারলেন না তিনি—তবে একটা উগ্র গন্ধ তাঁর নাকে এসেছিল বটে। আত্তিলিও ভাবতে লাগলেন এই বুঝি একজোড়া রোমশ বাহু জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর গলা চেপে ধরে!

গরিলা সম্বন্ধে যেসব গল্প শুনেছিলেন আত্তিলিও সেই গল্পগুলো এখন তাঁর মনে পড়তে লাগল। নিগ্রোদের মধ্যে অনেকেই নাকি গরিলার কবলে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ শিকারীদের মধ্যে যারা গুলি চালিয়েছে কিন্তু গরিলাকে হত্যা করতে পারেনি এবং তার ফলে গরিলার প্রচণ্ড মুষ্টি যাদের সর্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে তাদের কথা মনে পড়ল আত্তিলিও সাহেবের, গরিলার নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন পিগমিদের কাহিনীও তাঁর স্মরণপথে উঁকি দিল, আর-

আর ঠিক সেই সময় মটাৎ করে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ এল আত্তিলিওর বাঁদিক থেকে!

বিদ্যুৎ বেগে শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরলেন তিনি, কিন্তু কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না।

আবার একটা ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ এল সামনের দিক থেকে। পরের শব্দটা উঠল ডানদিকে। তারপর এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই শব্দ-কাদের ভারি পায়ের চাপে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে শুকনো গাছের ডাল। সেই সঙ্গে বড় বড় গাছের পাতার আলোড়ন-ধ্বনি। অরণ্যের বুকে শব্দের তরঙ্গ তুলে সরে যাচ্ছে অনেকগুলো অতিকায় জীব। যদি তাদের মধ্যে কারও হঠাৎ আত্তিলিওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার শখ হয়, তাহলে কি হবে? ঘন উদ্ভিদের জাল ভেদকরে অক্রমণকারীকে আবিষ্কার করার আগেই তো আত্তিলিও পড়ে যাবেন দানবের খপ্পরে। রাইফেল চালানোর সময় পাওয়া যাবে কি?

না, সে সব কিছু হল না অন্তত: এবারের মতো গরিলারা আত্তিলিও আর তাঁর দলবলকে রেহাই দিল। জন্তুগুলো সরে যাচ্ছে।

যে পাহাড়টার উপর আত্তিলিও তাঁর পিগমি সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই পাহাড়ের নীচের দিকই সশব্দে নেমে যাচ্ছে গরিলার দল। যাওয়ার আগে তারা বুঝি জানিয়ে দিয়ে গেল,

সাবধান ! চলে যাও এখান থেকে। কথা না শুনলে বিপদ হবে।

হ্যাঁ, চলে যেতেই চাইলেন আন্তিলিও। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাতে তাঁর একটু সময় লাগবে। সেদিন অন্ততঃ দানব-গরিলার সান্নিধ্যে আসার জন্য একটুও উৎসুক ছিলেন না আন্তিলিও, বরং ঐ ভয়ংকর জীবের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার জন্যই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কম্পাসের দিকে তাকিয়ে তিনি পিছন ফিরে তাঁবুর দিকে যাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন পিগমি-সর্দারের কাছে। সর্দার কাসিউলা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, তারপর সোজা এগিয়ে চলল নিজের খুশীমতো। পিছন ফিরে তাঁবুর রাস্তায় পা বাড়াল না। আন্তিলিওর মেজাজ খারাপ হল ; লোকটা আবার 'কিশোয়াহিলি' ভাষা ভাল বুঝতে পারে না, কিন্তু ঐ ভাষা ছাড়া আর কিভাবে আন্তিলিও ভাব প্রকাশ করবেন ? এত তাড়াতাড়ি তো আর পিগমিদের ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অতএব বার বার হাত নেড়ে পূর্বোক্ত ভাষাতেই তিনি বলতে লাগলেন, "তোমাকে পিছন ফিরতে বলছি না ? আমি তাঁবুতে ফিরতে চাই।"

সর্দার কাসিউলা খুব অমায়িকভাবে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আন্তিলিওর কথা সে বুঝেছে। কিন্তু যে পথ ধরে এগিয়ে গেলে তাঁবুতে পৌঁছানো যাবে বলে ভাবছিলেন আন্তিলিও, ঠিক তার উল্টো দিকের পথ ধরেই হাঁটতে লাগল কাসিউলা ! এমন নির্বিকার মানুষকে নিয়ে কি করা যায় ?—উপায়ান্তর না দেখে আন্তিলিও শেষ পর্যন্ত কাসিউলাকেই অনুসরণ করলেন। ফলে দেখা গেল ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনি এসে পড়েছেন তাঁবুর সামনে। আন্তিলিও বুঝলেন কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েও পিগমিরা নিখুঁতভাবে পথ চলতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও পিগমিরা কখনও পথ ভুল করে না। সত্যি, তাদের দিক্‌নির্ণয় করার ক্ষমতা অদ্ভুত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ * বামন ও দানবের দেশ

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। আঁত্তিলিও দানব-গরিলার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পিগমিদের মতো পথ চলার কায়দাটা রপ্ত করতে পারলেন না। প্রত্যেকদিনই অরণ্য ভ্রমণ সাঙ্গ করে আঁত্তিলিও ভাবতেন, 'আর নয়, এবার অন্ততঃ কয়েক দিন বিশ্রাম নেব।'

পরের দিন কাসিটুলা এসে ডাকামাত্র তিনি আবার বেরিয়ে পড়তেন, অরণ্য যেন দুর্বার আকর্ষণে তাঁকে টেনে আনতো।

প্রত্যেকদিন কাসিটুলা তার শ্বেতাঙ্গ অতিথিকে নিয়ে যেতো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। ঐ জায়গাগুলো ছিল গরিলাদের রাতের আস্তানা। তারা চলে যাওয়ার পর তাদের পরিত্যক্ত আস্তানা পর্যবেক্ষণ করে আঁত্তিলিও দুটি গরিলা-পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলেন। পরিবার দুটি দিনের বেলা একসঙ্গে ভ্রমণ করতো, কিন্তু রাতে তারা আশ্রয় নিতো পৃথক আস্তানায়।

ঐ আস্তানাগুলো তৈরি করতে গরিলারা যথেষ্ট পরিশ্রম করতো। দুটি বড় গাছের নীচে রাত্রিবাসের জন্য আস্তানা তৈরি করা হতো। প্রথমে গাছের তলায় মাটির উপর থেকে ঝোপঝাড়, শিকড়-বাকড় তুলে জায়গাটা পরিষ্কার করতো গরিলারা, তারপর সেই জায়গাটার উপর প্রচুর শ্যাওলা, গাছের পাতা বিছিয়ে প্রস্তুত করতো আরামদায়ক বিছানা। অন্তঃপুরের গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টাও ছিল—মোটা মোটা লায়ানা লতা টেনে এনে পর্দা দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যেতো ঐ আস্তানায়।

গরিলাদের সঙ্গে যখন ছোট বাচ্চা থাকে তখন মেয়ে-গরিলা আর বাচ্চারা গাছের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। দৈত্যাকৃতি পুরুষ গরিলা গাছের নীচে পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তার নিজের

আস্তানা ও শয্যা তৈরি করে, তারপর সেখানে নিদ্রা দেয়। তবে একেবারে চিৎপাত হয়ে তারা শুয়ে পড়ে না, গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে তারা নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। ঘুমের সময়েও বিপদের আশঙ্কায় তাদের ইন্দ্রিয় থাকে অতিশয় জাগ্রত, একেবারে অচৈতন্য হয়ে তারা কখনই নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করে না।

ভোর হলেই আবার গরিলারা বেরিয়ে পড়ে আহারের সন্ধানে। আত্তিলিও তাঁর পিগমি-বাহিনী নিয়ে গরিলাদের পরিত্যক্ত আস্তানা থেকে পদচিহ্ন ধরে জন্তু-গুলোকে অনুসরণ করতেন। এই ব্যাপারে কাসিউলার দক্ষতা অসাধারণ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আত্তিলিও সাহেব গরিলাদের পথ-চলার চিহ্ন আবিষ্কার করতে না পারলেও কাসিউলা নির্ভুলভাবে জন্তুগুলোর গন্তব্য পথ নির্ণয় করতে পারতো! কয়েক জায়গায় গরিলাদের পায়ের ছাপ তুলেছিলেন আত্তিলিও 'প্লাষ্টার অব প্যারিস' নামক পদার্থের সাহায্যে। সব চেয়ে বড় পায়ের ছাপ ছিল ১৪½ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্যন্ত পদচিহ্নের বিস্তার ৭½ ইঞ্চি। জন্তুটার দেহের ওজন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্য আত্তিলিও বলেছেন পিগমিদের পায়ের ছাপ যতটা গভীর হয়, তার চারগুণ গভীর হয়ে মাটির উপর পড়ে গরিলার পদচিহ্ন!

ঐ পায়ের চিহ্ন দেখে গরিলাদের চিনতে পারতো কাসিউলা। পিগমিরা তাদের এলাকার প্রত্যেকটি গরিলার নামকরণ করেছিল। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু শুধু পায়ের ছাপ দেখেই কাসিউলা বলে দিতো কোন্ কোন্ জন্তুর পদচিহ্ন।

খুব ধীরে ধীরে, পা চালিয়ে গরিলাদের অনুসরণ করতেন আত্তিলিও। অতিকায় বানরগুলোর গতিবিধি তিনি লক্ষ্য করতেন জঙ্গলের আড়াল থেকে অথবা গাছের উপর থেকে।

গরিলারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উদরস্থ করে। কারণ, তাদের দেহের পরিধি যেমন বিরাট, তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত জিনিস-

গুলোর আকার তেমনই অতিশয় ক্ষুদ্র। 'মিয়ান্দো' নামক এক ধরনের শাক তাদের প্রিয় খাদ্য। মিয়ান্দো ভক্ষণে ব্যস্ত একদল গরিলাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আক্তিলিং সাহেবের। একটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছিল মিয়ান্দো শাকের ক্ষেত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গরিলারা জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলল। ক্ষেতের সমস্ত শাক উদরস্থ করেই দলটা আবার খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র যাত্রা করল।

আহার্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্যই গরিলারা সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা বিস্তীর্ণ এলাকার ফলমূল, শাকসবজি তারা উদরস্থ করে ফেলে, অতএব খুব বেশী ঘোরাঘুরি না করলে তাদের রাক্ষুসে খিদে মিটবে কেন? গরিলাদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মিয়ান্দো শাক, বুনো কলা, বুনো পেঁয়াজ আর কাঁচ বাঁশের গোড়া। ভোরবেলা থেকে শুরু করে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলে তাদের ভ্রমণ আর আহার পর্ব—তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের খাদ্যসংগ্রহের বিরাম নেই। খুব সম্ভব সেইজন্যই তারা প্রতিরাত্রে নূতন নূতন রাতের আস্তানা তৈরী করতে বাধ্য হয়। আহারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তারা বিকালের দিকে আগের আস্তানা থেকে এত দূরে এসে পড়ে যে সেখানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না—অতএব রাত্রিবাসের জন্য নূতন ঘর না বেঁধে আর উপায় কি?

দুপুরবেলা গরিলারা যখন বিশ্রাম করে সেইসময় কয়েকদিন তাদের লক্ষ্য করেছিলেন আক্তিলিং। কয়েকটি পূর্ণবয়স্ক গরিলাকে সটান ঘাসের উপর লম্বা হয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে দেখা গেল, কয়েকটা জন্তু আবার গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ঘুম লাগাচ্ছে। একদিন একটা গরিলা-বাচ্চার কাণ্ড দেখে খুব মজা পেয়েছিলেন আক্তিলিং। একটা কিশোরবয়স্ক গরিলার সঙ্গে বাচ্চাটা খেলা করছিল। গাছের উপর-নীচে ছুটোছুটি করে পরস্পরকে তাড়া

করছিল খেলার ছলে, কখনও লায়ানা লতা ধরে ঝুলছিল প্রবল উৎসাহে, আবার কখনও বা লুকোচুরি খেলার আনন্দে তারা মশগুল। হঠাৎ বাচ্চাটা খেলা ছেড়ে তার মায়ের কাছে এসে পড়ল। মা বসে বসে ঢুলছিল, বাচ্চার বোধহয় সেটা পছন্দ হল না। সে প্রথমে মায়ের চারপাশে লাফালাফি করল, তারপর বুকের উপর লাফিয়ে উঠে চুল ধরে টানতে লাগল; অর্থাৎ যতরকমে সম্ভব মাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। গরিলা-মা প্রথমে কিছু বলেনি, কিন্তু অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন চোখ বন্ধ রেখেই বাচ্চাকে একটি 'মৃদু' চপেটাঘাত করল সে। থাপ্পড় খেয়ে বাচ্চাটা ফুটবলের মতো গোল হয়ে গড়াতে গড়াতে ছিটকে পড়ল অনেকদূরে! অবশ্য পরিত্রাহি চিৎকার করে সে জানিয়ে দিয়েছিল মায়ের ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগেনি।

গরিলা দলপতির গতিবিধি লক্ষ্য করা কিন্তু এত সহজ নয়। পথ চলার সময়ে সে থাকে দলের আগে। দল যখন পিছিয়ে আসে, সে তখন সকলের পিছনে। দলের গরিলারা যখন আহারে ব্যস্ত, দলপতি সেইসময় চারধারে ঘুরে ঘুরে টহল দেয়, নজর রাখে চারিদিকে—শত্রুর আবির্ভাব হলে তার প্রথম মোকাবেলা করে দলপতি। দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি, রোমশ কৃষ্ণ দেহের পৃষ্ঠদেশে কালোর বদলে রূপালি রংএর ছোঁয়া-মাখানো বিরাট শরীর নিয়ে গরিলা দলপতি যখন ধীর পদক্ষেপ বনের পথে বিচরণ করে, তখন মনে হয় অরণ্য-সম্রাট তার রাজত্ব পরিদর্শন করে ফিরছে!

গরিলারা যখন স্থানত্যাগ করে অপরস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হতো, ঠিক সেই সময় তাদের অনুসরণ করতেন না আক্তিলিও। কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝেছিলেন পিগমিদের মতো নিঃশব্দে ঘন জঙ্গলের ভিতর চলাফেরা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। ভারি জুতো আর ভারি শরীর নিয়ে ধুপধাপ করে বনের মধ্যে যাতায়াত করতে গিয়ে গরিলাদের চমকে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের

মেজাজ খারাপ থাকলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই, সেরকম বিপদজনক কিছু না ঘটলেও অতি দ্রুতবেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে তারা যে অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধাবমান গরিলাদের নাগাল পেতে হলে আবার কয়েকঘণ্টা ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পিছু পিছু ছোটা দরকার। সেইখানেই আত্তিলিওর প্রবল আপত্তি, ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনর্থক ছুটোছুটি করে কষ্ট পেতে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। অতএব গরিলারা কিছুদূর এগিয়ে গেলে পিগমি-সর্দার কাসিউলার নির্দেশ অনুসারে পিছু তাদের নিয়ে এগিয়ে যেতেন আত্তিলিও এবং ঐভাবে চলাফেরা করার ফলে অনুসরণকারী মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেনি গরিলার দল।

আগেই বলেছি ঐ অঞ্চলের গরিলাদের প্রত্যেকটির নামকরণ করেছিল পিগমিরা। 'কিটাম্বো' নামে একটা মস্ত পুরুষ-গরিলাকে পিগমিরা ভীষণ ভয় করতো, কিন্তু আতঙ্কের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার ভাবও দেখেছিলেন আত্তিলিও। একদিন কাসিউলাকে ডেকে আত্তিলিও জিজ্ঞাসা করলেন এমন ভয়ানক জন্তুটাকে তারা হত্যা করেনি কেন? উত্তরে কাসিউলা জানাল শ্বেতাঙ্গদের আইনে গরিলা মারলে শাস্তি পেতে হয় বলেই তারা উক্ত কিটাম্বোর অস্তিত্ব সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আত্তিলিও বুঝলেন কাসিউলা মিথ্যা কথা বলছে। গরিলার মাংস যে পিগমিদের প্রিয় খাদ্য এবং শ্বেতাঙ্গ শাসকের আইন অমান্য করে তারা যে সুযোগ পেলেই গরিলা শিকার করে সেই তথ্য আত্তিলিওর অজ্ঞাত ছিল না। সাদা মানুষের আইনের কথা নিতান্তই বাজে কথা, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মহাশক্তিধর কিটাম্বোর হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ছিল না বলেই পিগমিরা তাকে কখনও হত্যার চেষ্টা করেনি।

স্বয়ং কমিশনার সাহেব আত্তিলিওকে জানিয়ে ছিলেন পিগমীদের

গরিলা শিকার থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও বেলজিয়ামের শ্বেতাঙ্গ-সরকার সুবিধা করতে পারেন নি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে সুবিধা পেলেই পিগমিরা গরিলা মেরেছে। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভিতর ঢুকে দোষীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। কিন্তু সরকারের আইনের সাহায্য ছাড়াই গরিলারা যে খর্বকায় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে তাদের অস্তিত্ব বাজায় রাখতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে তাদের নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ। মাঝে মাঝে গরিলা শিকার করলেও কয়েকটা অতি-বৃহৎ অতি-হিংস্র গরিলার সামনে যেতে ভয় পেতো পিগমিরা, তাদের বর্শা আর তীরধনুক নিয়ে ঐসব অরণ্যচারী দানবের মোকাবিলা করা অসম্ভব। কিটাম্বোর মতোই ভয়ানক আর একটি পুরুষ-গরিলা পিগমিদের এলাকার মধ্যে বাস করতো। কিটাম্বোকে নিয়ে পিগমিরা বিশেষ মাথা ঘামাতো না, কিন্তু 'মোয়ামি ন্‌গাগি' নামক অপর গরিলাটি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল যথেষ্ট। মোয়ামি ন্‌গাগিকে পারলে নিশ্চয়ই হত্যা করতো কাসিউলা, সেই চেষ্টাও যে হয়নি তা নয়, তবে পূর্বের অভিজ্ঞতার ফলে কাসিউলা জেনেছিল ঐ ভয়ংকর দানবের সামনে গেলে পিগমিদের মৃত্যু অবধারিত, তাই অনর্থক দলের লোকের প্রাণ বিপন্ন না করে অন্য উপায়ে তাকে বধ করতে চেয়েছিল পিগমি-সর্দার সুলতানি কাসিউলা।

মোয়ামি ন্‌গাগি নামের ভয়ংকর গরিলাটি সম্পর্কে সব কথা খুলে বলেছিল কাসিউলা আত্তিলিওর কাছে। নিজেদের জীবন বিপন্ন না করে জন্তুটাকে হত্যা করার অন্য উপায় থাকলে সে তাই করবে একথাও বলেছিল কাসিউলা—কিন্তু সেই 'অন্য উপায়' যে কি হতে পারে সে বিষয়ে সে কোনও আলোচনা করেনি এবং আত্তিলিও সাহেব ঐ ব্যাপারে পিগমি-সর্দারের নীরবতা নিয়ে মাথা ঘামাননি। মাথা ঘামালে ভাল করতেন, অন্ততঃ কয়েকটা ভয়ংকর মুহূর্তের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। পরে যখন কাসিউলার

পরিকল্পনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তখন আর বিপদকে এড়িয়ে যাওয়ার সময় ছিল না—তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত! অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাইফেল হাতে সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়েছিলেন আক্তিলিও নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ গরিলারাজ 'মোয়ামি ন্‌গামি'

পিগমিদের ভাষায় 'মোয়ামি ন্‌গাগি' কথাটির অর্থ হচ্ছে গরিলার রাজা। পিগমিদের এলাকার গরিলাদের মধ্যে পূর্বোক্ত গরিলাটি ছিল সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভয়ংকর। গরিলারা খুব শান্তশিষ্ট নয়, কিন্তু গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগির মতো হিংস্র ও উগ্র চরিত্র গরিলাদের মধ্যেও দেখা যায় না।

পিগমি-দলপতি কাসিউলা ঐ গরিলাটিকে ঘৃণা করতো। ঘৃণাটা অহেতুক নয়। কয়েক বছর আগে কাসিউলার দলভুক্ত ছয়টি পিগমি -শিকারীর সঙ্গে তার ছেলেরাও গিয়েছিল খাবারের জন্য সাদা পিঁপড়ে ধরতে। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে গরিলারাজ 'মোয়ামি ন্‌গাগি' পিগমিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাসিউলার এক ছেলে এবং তার এক সঙ্গী গরিলার ভয়ংকর আলিঙ্গনে ধরা পড়ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সর্বাঙ্গ হয়ে গেল চূর্ণ-বিচূর্ণ। দলের অন্য সবাই পালাল। দুটি মানুষকে হত্যা করেও দানব ক্ষান্ত হতে চাইল না, মৃতদেহ দুটি মাটিতে ফেলে সে পলাতক পিগমিদের তাড়া করল।

আত্মরক্ষার জন্য পিগমিরা এইবার তাদের প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করল। গরিলা তেড়ে এলে পিগমিরা পালাতে পালাতে বর্শাদণ্ড উল্টো করে মাটিতে বসিয়ে দেয়—বর্শাদণ্ড এমনভাবে মাটিতে গেঁথে যায় যে, ধারালো ফলার মুখটা ঘোরানো থেকে অনুসরণকারী গরিলার দিকে এবং ঐভাবে বর্শাদণ্ড মাটিতে বসিয়ে দেওয়ার সময়ে

পলাতকরা এক মুহূর্তের জন্যও থামে না, তাদের গতিবেগ থাকে অব্যাহত। ফলে যে পথ দিয়ে পিগমিরা পালাতে থাকে সেই পথের জায়গায় জায়গায় ঘন পত্র পল্লবের অন্তরাল থেকে মাটির উপর কোনাকুনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকগুলো বর্শার উদ্যত ফলা গরিলাকে অভ্যর্থনা করার জন্য! ক্ষিপ্ত গরিলা নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, দারুণ ক্রোধে সাময়িকভাবে সাবধান হওয়ার কথাও সে ভুলে যায়—তার ফলে পিগমিদের পিছু নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়ে বল্লমে কণ্টকিত পথের উপর, আর অনিবার্য ভাবেই দানবের ধাবমান বিপুল দেহের গতিবেগে একটা না একটা বর্শা সবেগে ঢুকে যায় তার বুকে কিংবা পেটে!

সেদিনও পূর্বোক্ত কৌশল প্রয়োগ করল পলাতক বামনের দল। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে থমকে দাঁড়াল গরিলারাজ—তার বিপুল উদরদেশে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছে একটি বর্শা!

পিগমিরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে আহত জন্তুটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। গরিলা বর্শাটাকে পেট থেকে বাইরে আনার জন্য প্রাণপণে টানাটানি শুরু করল। সেজন্য জন্তুটার খুবই কষ্ট হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কারণ বর্শাফলকের দুই প্রান্ত বাঁকা 'হুক'-এর মতো তৈরি করে পিগমিরা—একবার শরীরের ভিতর ঢুকলে ঐ বাঁকানো ফলা দুটো আর সহজে বাইরে আসতে চায় না।

কয়েকবার টানাটানি করেও যখন গরিলা বর্শাটাকে পেট থেকে বাইরে আনতে পারল না, তখন সে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে বনের ভিতর অদৃশ্য হল। পিগমিরা ভাবল জন্তুটা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও মরে থাকবে। কয়েক মাস পরে আহত গরিলা আবার পিগমিদের এলাকাতে দর্শন দিল। এবার সে একা নয়, এক সুবৃহৎ গরিলা পরিবারের দলপতি হয়ে ফিরে এসেছিল মোয়ামি ন্‌গাগি—তার দেহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বভাব আগের চেয়েও উগ্র, আগের চেয়েও ভয়ংকর!

একদিন দুপুরবেলা আন্তিলিও যখন কিটাম্বোর দলের পিছু নিয়েছেন, সেই সময় হঠাৎ কাসিউলা থমকে দাঁড়াল। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে কিছু শুনল, বাতাসে কয়েকবার ঘ্রাণ গ্রহণ করল, তারপর পার্শ্ব-বর্তী ঝোপ-ঝাড় পরীক্ষা করতে লাগল।

ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অধিকাংশ সময়েই ঐভাবে গরিলাদের গন্তব্যপথ নির্ণয় করে থাকে কাসিউলা, কাজেই আন্তিলিওর মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয় নি। কিন্তু সে যখন ফিস ফিস করে বলল," ঐ যে ওদিকে গেছে ন্‌গাগি," এবং সামনের পর্বতচূড়ার দিকে অগ্রবর্তী অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আন্তিলিওকে এগিয়ে যেতে বলল, তখনই তাঁর সন্দেহ হওয়া উচিত। আন্তিলিও সাহেব দারুণ উত্তেজনায় অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন, তার উপর দুর্গম অরণ্যে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার ফলে তিনি এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কাসিউলার আচরণের অসঙ্গতি তাঁর নজর এড়িয়ে গেল। তিনি যদি সতর্ক থাকতেন তবে নিশ্চয়ই জানতে চাইতেন অন্যান্য বারের মতো সামনে এগিয়ে পথ-প্রদর্শক হওয়ার পরিবর্তে হঠাৎ কাসিউলা এখন নিজে পিছনে থেকে তাঁকে এগিয়ে যেতে বলছে কেন? আন্তিলিওর বরাত খারাপ, কাসিউলাকে কোন প্রশ্ন না করে তিনি বোকার মতো পায়ের ছাপ-গুলোকে অনুসরণ করলেন।

পাহাড়ের গা ছিল ভীষণ খাড়া। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন আন্তিলিও। 'মসার রাইফেলটা' যাতে লতা আর উদ্ভিদের জালে জড়িয়ে না যায় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, তাই আশে পাশে দৃষ্টি দেবার অবসর তাঁর হয় নি। আন্তিলিও বরাবরই লক্ষ্য করেছেন জঙ্গলের পথে পিগমিরা ছায়ার মতো নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে যায়। তাই তাদের সাড়া শব্দ না পেলেও বামনরা যে তাঁর পিছন পিছন আসছে সেবিষয়ে আন্তিলিও ছিলেন নিঃসন্দেহ। ঝোপ-ঝাড় আর লতাপাতার বাধা ভেদ করে খাড়াই

বেয়ে উঠছিলেন আস্তিলিও, মনে মনে ভাবছিলেন এই সময় যদি পাহাড়ের উপর থেকে কোনও গরিলা হঠাৎ তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে তিনি তো রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগই পাবেন না—তলা থেকে বর্শা চালিয়ে পিগমিদের পক্ষেও ঐ রকম আক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয়। গরিলা যদি ঐ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তার প্রকাণ্ড দেহের ভারে পিষ্ট হয়ে সকলের মৃত্যু হবে, জন্তুটাকে আর কষ্ট করে হাত পা চালাতে হবে না—

অতএব চটপট পাহাড়ের উপর সমতল ভূমিতে পা রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আস্তিলিও।

হাঁপাতে হাঁপাতে আর দুড়দাড় শব্দে ঝোপঝাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আস্তিলিও পাহাড়ের উপর একটা ডিম্বাকৃত সমতল ভূমির উপর এসে পৌঁছালেন। ঐরকম শব্দ করে গরিলার পিছু নেওয়া নির্বোধের কাজ, কিন্তু আস্তিলিও ঘন জঙ্গলের মধ্যে পিগমিদের মতো নিঃশব্দে দ্রুত চলাফেরা করতে পারতেন না। উপরে পৌঁছে ঝোপঝাড়, ঘাসপাতা আর বৃক্ষশাখার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আর রাইফেলটা মুক্ত করলেন আস্তিলিও, তারপর যে লায়ানা লতাটা এর মধ্যে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল সেটাকে টানাটানি করে সরিয়ে দিলেন তিনি। যাই হোক, এতক্ষণ বাদে একটা সমতল স্থানে পা রাখতে পেরে আস্তিলিও একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মৃদুস্বরে কাসিউলাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি-আচম্বিতে তাঁর কানের পর্দা ফাটিয়ে জেগে উঠেছে তিন-তিনটি কণ্ঠের বীভৎস চীৎকার!

পরক্ষণেই সামনের ফাঁকা জায়গার বিপরীত দিকে অবস্থিত জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল তিনটি বিপুলাকৃতি গরিলা!

এতক্ষণ পরে আস্তিলিওর বুদ্ধি খুলল—

কাসিউলা পরিচয় করিয়ে না দিলেও মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝে ফেললেন আক্রমণকারী গরিলাদের সামনে এগিয়ে এসে যে

দানবটা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে কিটাম্বো নয়—স্বয়ং মোয়ামি ন্‌গাগি! উক্ত গরিলার মেজাজ খুব ভাল নয় বলেই শুনেছিলেন আত্তিলিও, অন্ততঃ সেই মুহূর্তে তার খারাপ মেজাজ যে আরও-খারাপ হয়েছে, সে বিষয়ে আত্তিলিওর একটুও সন্দেহ ছিল না।

আরও একটি কারণে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন! এতক্ষণ তাঁর ধারণা ছিল পিগমিরা ধারে কাছেই আছে। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর ত্রিসীমানায় মধ্যে কেউ নেই।

আত্তিলিও দেরী করলেন না, রাইফেল তুললেন। সবার আগে ধেয়ে আসছে গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগি, তার জলন্ত কয়লার মতো দুই প্রদীপ্ত চক্ষু আর হাঁ করা মুখের দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি।

জন্তুটার বুক লক্ষ্য করে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। গরিলা মাটিতে পড়ল না! সে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল। তার গতিবেগ হয়ে উঠল দ্রুত থেকে দ্রুততর—ঝড়ের বেগে সে এগিয়ে আসতে লাগল আত্তিলিওর দিকে।

আত্তিলিও হতভম্ব! এত কাছ থেকে তিনি কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন? গরিলা তখন তাঁর কাছ থেকে প্রায় বিশ ফিট দূরে আছে। রাইফেলে গুলি ছিল না, চটপট গুলি ভরে আত্তিলিও আবার রাইফেলের ঘোড়া টিপলেন।

দ্বিতীয় বারের উদ্যম ব্যর্থ হল না। গরিলা থেমে গেল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। জন্তুটা এত কাছে এসে পড়েছিল যে, তার দেহে ধাক্কায় একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে ছিটকে এসে লাগল আত্তিলিওর হাঁটুতে।

গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু তখনও আত্তিলিওর বিপদ কাটে নি। দানবের দুই সহচরী ধেয়ে আসছে তাঁকে লক্ষ্য করে। রাইফেল তুললেন আত্তিলিও, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কমিশনার সাহেবের সাবধানবাণী—

'জেল! জরিমানা! বহিষ্করণ!'

ওরে বাবা! গরিলার চাইতে কমিশনারের আইন কিছু কম বিপদজনক নয়! আত্তিলিও শূন্যে রাইফেল তুলে তিনবার আওয়াজ করলেন। বরাত ভাল, তাতেই কাজ হল। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে মেয়ে-গরিলা ছুটো পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আত্তিলিও মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল না। একটু দূরেই ধরাশায়ী গরিলারাজের প্রকাণ্ড মৃতদেহটা তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আর হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রের গুণে জনশূন্য অরণ্য দলে দলে মানব-সন্তান প্রসব করতে শুরু করল! একটু আগেই যেখানে জন-মানুষের চিহ্ন ছিল না, সেখানেই কোথা থেকে কে জানে এসে দাঁড়াল একদল বেঁটে বেঁটে মানুষ। মানুটি পিগমি!

সুলতানি কাসিউলা বীর বিক্রমে এগিয়ে এসে মৃত গরিলার মস্ত বড় উদরের উপর পা তুলে দিল, তারপর পেটের উপর একটা শুষ্ক ক্ষতচিহ্নের দিকে আত্তিলিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাল কয়েক বছর আগে ঐ জায়গাতেই পিগমিদের বর্শা বিঁধেছিল।

"যাক এতদিনে প্রতিশোধ নেওয়া হল", সগর্বে বলে উঠল কাসিউলা, "মোয়ামি ন্‌গাগি মারা গেছে।"

শেষ